একমাত্র পরিবেশক

বুক্‌স অ্যাণ্ড বুক্‌স

৪০।১, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ
মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক -
এ, এইচ. গোলদার
৬, এন্টনীবাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী—
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর ··
শ্রীহেমন্তকুমার পোদ্দার,
পোদ্দার প্রিন্টার্স
৪এ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ—
রেজ প্রিণ্টারী
৭৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

গ্রন্থণ—
আলম এণ্ড কোং
১৬, পাটোয়ারবাগান লেন
কলিকাতা-৯

মূল্য
। তিন টাকা ।

॥ এক ॥

এ বাড়িতে বিয়ে হওয়া কমলের সৌভাগ্য বই কি! মেয়ের জোর বরাত তাই খুঁজতে পাততে হলো না, হাতের কাছে এমন বর মিলে গেল। বর যেন তার জন্য মজুত করা ছিল। হাঁটাহাঁটি নয়, কচলা-কচলি নয়, দর দস্তুর নয়, কুষ্ঠি জন্মপত্রিকার ঝলখলি নয়, এক কথায় হাসিমুখে বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ। জানা ঘর। আর চাই কী? বরের বাবা কনের বাবাকে বললে, তোমার মেয়েটিকে আমার বউ করবো। কনের বাবা স্বর্গ হাতে পেলো। বড় ঘর। ধনে মানে কুলে শীলে এর চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পরিবার আর কোথায় মিলবে! জামাইও কন্দর্পের মত রূপবান আর স্বাস্থ্যবান। সুপাত্র বই কি! সবার উপরে দেনাপাওনার কোন কথা নেই। আজ কালকার দিনে এমন সম্বন্ধ মেয়ের সৌভাগ্য বলে মানতে হবে অবধারিত। হিংসা করবার মত সৌভাগ্য। হলোই বা মেয়ে সুন্দরী। সুন্দরী আর শিক্ষিতা মেয়ে তো বাজারে ঝাঁক ঝাঁক মেলে, কিন্তু এমন নিরুপদ্রবে, নিঃশব্দে আর এক কথায় ক-জন মেয়ের বিয়ে হয়?

কমলের সৌভাগ্য বলতে হবে বই কি!

পয়মন্ত মেয়ে!

কপালে লক্ষ্মীপুজোর প্রদীপ জ্বলছে

পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে কমলের। এরি মধ্যে দু-টি ছেলেও হয়েছিল। কিন্তু ছেলে দুটি বাঁচলো না। একটি আঁতুরেই মারা গেল। আরেকটি জন্মাবার কিছুদিন পরেই মারা গেল। দু-বারের এই উৎপীড়িত মাতৃত্ব কমলের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দিল। মনের আলো নিবিয়ে দিল।

চিকিৎসার ত্রুটি হলো না। কিন্তু কিছুতেই সে সামলে উঠতে পারল না। সদাই মন-মরা আর একটা অবসন্ন ভাব। স্বামী পুলকেশ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ছটফট করে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন, বায়ু পরিবর্তনের। শরীরের পক্ষে ওর দরকার মুক্ত আকাশ, প্রচুর আলো-বাতাস আর বিস্তৃত নির্জনতা। মনের দিক থেকে স্থান পরিবর্তন বা নতুন পরিবেশ ওর শোকাতুর মনে আনবে একটা প্রসন্ন প্রশান্তি। একটা অনাবিল স্নিগ্ধতা। পশ্চিমের রৌদ্রোজ্জ্বল মধুর শরৎ শ্রান্তিভরা মনে প্রকৃতই একটা গভীর বিশ্রামের স্বাদ এনে দেয়।

যাত্রার আয়োজন চলল।

কমলের দিক থেকে, কিন্তু কোন উৎসাহ নেই। ঔৎসুক্য নেই। ও চুপচাপ। বিগতদিনের দুঃখস্মৃতির অতলে যেন ও অবগাহিত। অজানা এক মৌনব্যথার ভারে ও যেন মাথা তুলতে পারে না।

স্বামী এসে কাছে বসে। যাত্রার ব্যবস্থা এবং স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়। কমলার কিন্তু ভাল লাগে না স্বামীর এই নিকটতম সান্নিধ্য। একটা বিতৃষ্ণা জাগে তার মনে। মুখে সে জোর করে হাসি ফুটিয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কী হয়েছে আমার যে দুঃশ্চিন্তায় মুখ কালো করে আছো?

দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই জানতে পারলে যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি কমল।

কমল মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বললে, না গো না। আমার শরীর আমি বুঝি না। এখন তো আমি বেশ ভালোই আছি।

—এর নাম ভালো থাকা নয় কমল। নিজের চেহারাটা যদি আয়নায় একবার খুঁটিয়ে দেখো তা হলে বুঝতে পারবে তুমি কী হয়ে গেছো।

পুলকেশের গলার স্বর ভিজে এলো। কমলকে কিন্তু সে স্বরের মোহ ভেজাতে পারলে না। বরং একটা বিরুদ্ধ আক্রোশই তার মনে

গর্জে উঠলো। সে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠলো, তার জন্যে দায়ী কে? মানুষের শরীর যে লোহা দিয়ে গড়া নয়, একথা তোমরা—পুরুষে কি ভাবো?

পুলকেশের মুখখানা কালো হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এই অস্বস্তিকর ইঙ্গিতটা চাপা দেবার জন্যই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল: এবার কিন্তু বিদেশ থেকে শরীর ভালো করে আসতে হবে।

পুলকেশ কমলের একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ালো। কমল কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বিছানার পাশে সরে গেল। আহত পুলকেশ চকিতে কমলের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো কমল?

কমল একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে ঝলসে উঠলো, না না। আমাকে বকিয়ো না। দয়া করে আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

স্বামীর উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার কমলকে তার স্বামীই দিয়েছে। স্বামী হিসাবে পুলকেশ আদর্শ বরং কিছুটা স্ত্রৈণ বলা চলে। স্ত্রীকে যে সে কেবল ভালোবাসে তা নয়। তাকে দেখে সে মুগ্ধ। তার অপরিসীম রূপরাশি, তার দেহের দীঘল গড়ন, তার চলার ছন্দ ও গতিভঙ্গির প্রতিটি খুটিনাটি দেখে দেখে তার দেখা ফুরোয় না।

আর কেউ না জানুক, কমল কিন্তু মনে প্রাণে জানে, সে তার স্বামীকে কোনদিন ভালোবাসেনি, চেষ্টা করেও ভালোবাসতে পারেনি। তার সমর্পণের নিচে প্রাণ নেই, প্রেম নেই। স্বামীর আলিঙ্গনের নিচে তার বুকের ভেতরটা বরফের মত জমে শক্ত হয়ে যায়। নিজেরই তার কেমন খারাপ ঠেকে। পুলকেশের সন্তানকে গর্ভে ধরা নিছক দৈবের ঘটনা। বিধিলিপি। মনে তার ফুল ফোটেনি। দেহ কামনা করেনি। কামনা করেনি বলেই বোধ হয় তারা বাঁচলো না। জীবনের স্ফুলিঙ্গ তো কোনদিন তার মাঝে জ্বলে ওঠেনি। বরং একটা ঘৃণা আর নিরুপায়তার বেদনা তার মাঝে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সে ছাড়া একথা আর কেউ জানে না। বোঝে না। কেউ কল্পনা করতে পারে না যে তার অন্তরে স্বামীর জন্য একটুও নরম মাটি নেই। ভালোবাসার ক্ষুদ্রতম অনুভূতিটি নেই।

কমলা সময়ে সময়ে নিজেই বিস্মিত হয়ে যায়। স্বামীর শয্যায় শুয়ে স্বামীকে নিবিড়তম সান্নিধ্য দিয়েও তাকে ফাঁকি দেয়। তবে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে সদাই সচেতন। সেই শক্তির উপর ভর করেই সে দৃঢ়মুষ্টিতে এই বৃহৎ সংসারের হাল ধরে রেখেছে।

পুলকেশকে সে চায়নি। এ বাড়িতে সে আসতে চেয়েছিল। চেয়েছিল এই বিপুল ঐশ্বর্য। এ বাড়ির বউ-এর মর্যাদা। তা সে পেয়েছে।

সম্পদ আর সম্মান। প্রেমের কাছে অবশ্য নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু বিবাহিত জীবনে, প্রেম যেখানে দুষ্প্রাপ্য, সেখানে সম্পদ ও সম্মান মূল্যবান বই কি। শাখা সিঁদুরের মত এয়োতির সম্বল।

কলেজের সাজ-পোষাক করে ঘরে ঢুকে বিপাশা বললে, তোমার মেল এসেছে রাঙাপিসি!

কমলের হাতে একখানা ভারী খাম দিয়ে বিপাশা বললে, বিলেতের ডাক। এয়ার মেলে এসেছে।

চিঠিখানা হাতে নিয়েই হাসিমুখে কমল বললে, অমলেশের চিঠি।

খাম খুলতেই একখানা পোষ্টকার্ড সাইজের ফটো বেরুল চিঠির সঙ্গে।

অমলেশের ফটো।

পলকহীন চোখে কমল ছবিখানার পানে চেয়ে তন্ময় হয়ে গেল। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে! চেনা যায় না। অপরূপ একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ছবিখানা তোলা। অস্পষ্ট অথচ অদ্ভুত মধুর হাসিতে মুখ ভরে সে তাকিয়ে আছে যেন কমলের মুখপানে। কালো চোখ দুটি আরো আয়ত আর উজ্জ্বল হয়েছে। চোখের চাউনিতে যেন বিদ্রূপের কটাক্ষ।

কমলের পরাভবকে ইঙ্গিত করে এ যেন নিষ্ঠুর উল্লাসের কটাক্ষ। দেহ আরো সবল ও সতেজ হয়েছে। মুখের রেখায় নেমেছে পরিণত পৌরুষের গাঢ় ছায়া। বনানীর বুকে আষাঢ় মেঘের কাজলঘন ছায়ার মত। কমলের শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। তার বুকের তলায় কাঁপন ধরে। তার কম্পিত ওষ্ঠে অদ্ভুত একটি হাসি ভেসে বেড়ায়। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দুচোখ ভরে দেখে। দেখা যেন আর ফুরোয় না। বিপাশার বুঝতে বাকি থাকে না যে তার পিসি-মার বুকে ভাবের জোয়ার এসেছে। তার মুখে একটা নতুন দীপ্তি। তার শরীরময় গাঢ় শ্যাম বনচ্ছায়া। তার চোখে অনুরাগের রক্তিমা। বিপাশা ছবিখানার পানে চেয়ে বলে ওঠে. কী সুন্দর দেখতে! পিসেবাবুর সঙ্গে একটুও মিল নেই।

মুখ না তুলেই ভাবের ঘোরে কমল জবাব দেয়, না। এক মা-র পেটের ভাই তো নয়।

—তাই বুঝি? তোমার শ্বশুরের দু' বিয়ে, না?

—হ্যাঁ! তোর পিসেবাবুর মা মারা গেলে তিনি অমলেশের মা-কে বিয়ে করেছিলেন।

—তাই বুঝি তুমি ওঁকে ঠাকুরপো বলোনা?

কমলের শীর্ণ পাংশু মুখখানা লালচে হয়ে ওঠে। বলে, দুর্! তা কেন? আমি ছেলেবেলা থেকে ওকে নাম ধরে ডেকে আসছি।

বিপাশা উৎসুক দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, বিয়ের আগে থেকেই বুঝি তোমার সঙ্গে জানা-চেনা ছিল?

উৎসাহের কণ্ঠে কমল বলে, হ্যাঁ। আমার বিয়ের আগেই তো ও বিলেত গেছে। ছেলেবেলায় দুজনের কী ভাবই ছিল। একসঙ্গে খেলেছি, পড়েছি, গল্প করেছি। কম মার খেয়েছি ওর কাছে! চুলের মুঠি ধরে উঃ! কী মার মারতো! ভারী দুরন্ত ছিল ছেলেবেলায়!

অজ্ঞাতে কমলের একটা দীর্ঘশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে

আসে। বিপাশার কর্ণগোচর হয় তার কণ্ঠের শব্দায়মান ব্যথা, তার বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস!

আচমকা বিপাশার কণ্ঠ পিছলে উচ্চারিত হয়ঃ তুমি ওঁকে ভালোবাসতে রাঙা পিসি?

চমকে ওঠে কমল। সে দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে, তখন আমি খুব ছোট। ভালোবাসার মর্ম বুঝতুম না। তবে—

কমলের পুঞ্জিত ব্যর্থ-বেদনা যেন হঠাৎ একটা ছিদ্র পেয়ে বাইরে আসবার জন্য আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। সে সঙ্ক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, তবে ওকে ভালো লাগতো।

বিপাশা কলেজের মেয়ে। বয়সে ছোট হলেও আধুনিক বহির্জগতের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অনেক কিছু জানে সে। অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে, পড়েছে। সে গম্ভীরভাবে বলে, ঐ ভালো লাগার নামই ভালোবাসা।

কমলের বিশীর্ণ ঠোঁটের প্রান্তে ভেসে ওঠে, স্বীকৃতির ম্লান হাসি।

পুলকেশকে কমল বললে, অমলেশ ফিরে আসছে এই মাসে। চিঠি লিখেছে। এয়ারে আসবে। এখন বাইরে যাওয়া বন্ধ থাক। সামনে শীত। পরে গেলেও চলবে।

পুলকেশ বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, তার জন্যে তোমার বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকবে কেন?

—কতোদিন পরে সে দেশে ফিরছে। এ সময় আমার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা কি ভালো দেখায়?

—লৌকিকতার চেয়ে নিজের শরীরটা অনেক বড়ো জিনিষ কমল।

পুলকেশের গলায় কেমন বিদ্বেষের আভাস।

কমল কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। পরে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো, মার পেটের ভাই হলে এ-কথা বলতে পারতে না। মুখে বাধতো।

পুলকেশ অন্তরে লজ্জা পেলেও মুখে নির্লজ্জের মত হাসল।

কমল মুখ ঘুরিয়ে বললে, তুমি চাও না যে সে দেশে ফেরে।

—কেন? আমার লাভ?

—লাভ আছে বই কি!

পুলকেশ জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তার পানে তাকায়।

কমল রূঢ়স্বরে বলে, সে ফিরে এলেই তোমাকে বিব্রত হয়ে উঠতে হবে। কারণ তার অংশের হিসেব নিকেশ করতে হবে।

পুলকেশ সেই ধরণের স্বামী, যারা দাম্পত্য জীবনে কখনো অশান্তি ঘটাতে চায় না। মন তিক্ততায় ভরে উঠলেও, কখনো তা মুখ ফুটে প্রকাশ করে স্ত্রীর বিরাগভাজন হতে চায় না। পুলকেশ তাই মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, তার জন্যে তোমার এখানে থাকবার প্রয়োজন নেই।

মুখখানা শক্ত করে গলায় বেশ জোর দিয়েই কমল জবাব দিল, প্রয়োজন আছে। আমার কর্তব্য বাড়িতে থেকে তার প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানো। তার উপস্থিতিকে আনন্দ মুখর করে তোলা। দীর্ঘ দিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসছে। এ সময় শরীরের দোহাই দিয়ে আমার বাইরে গিয়ে বসে থাকা চলে না।

পুলকেশ প্রতিবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পেলে না। কমলের এই অনমনীয় কঠোরতা তার মনের মাঝে একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল।

কমল বললে, এমনিতেই তো পাঁচজনে বলে বেড়াচ্ছে, ওকে কিছু হাততোলা পাঠিয়ে দিয়ে আমরা ওর সর্বস্ব লুটে খাচ্ছি।

—তাই নাকি?

—কেন, এ-কথা কি আজ আমার কাছে নতুন শুনলে? আমাদের অন্দরমহলের দোর ঠেলে যে-কথা ভেসে আসে, সে কথা পৌঁছয় না শুধু তোমার কানে? আশ্চর্য!

পুলকেশ তরল হাসিতে মুখ ভরে বললে, অন্দরমহলের কান বড়ো পাতলা।

কমল প্রসঙ্গটা শেষ করবার জন্যই যেন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সঙ্ক্ষিপ্ত আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে বললে, এবার এসে সে আপনার হিস্‌সা বুঝে নিক। আমরা দায় থেকে খালাস।

পুলকেশ প্রশ্ন করলে, সে কথাও কি তোমাকে লিখেছে নাকি?

কমল মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার প্রশ্নের জবাব দিল না।

॥ দুই ॥

পুলকেশ আর অমলেশ। বৈমাত্র ভাই। পুলকেশ বড়। অমলেশ ছোট।

পুলকেশের বিয়ের আগেই অমলেশ ইতালি গেল। চিত্রবিদ্যা শিখতে।

সে প্রায় সাত বছরের কথা।

সারা য়ুরোপ ঘুরে এতদিন পরে সে দেশে ফেরবার সঙ্কল্প করেছে। কমলকে জানিয়েছে তার সঙ্কল্পের কথা।

বিয়ের আগে থেকেই এ বাড়ির সঙ্গে কমলের ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাতায়াত ছিল। যে বয়সে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ির স্বপ্ন দেখে সেই বয়স থেকেই কমল এই বিত্তশালী পরিবারটিকে আশ্রয় করে এই বাড়ির বধু হবার স্বপ্ন দেখেছে। এলো ও সে এই বাড়িতে। লক্ষ্যে এসে পৌঁছল। শুধু ভুল পথ দিয়ে। যে-পথ দিয়ে সে আসতে চেয়েছিল সে-পথ রইলো তার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে।

চিনতো সে অমলেশকে। পরিচয় তার অমলেশের মায়ের দৌলতে। অমলেশ ছিল তার খেলার সাথি।

কেমন করে, কে জানে, মনে তার অন্ধ-প্রত্যয় জন্মেছিল, অমলেশ দেবে তার সৌভাগ্যের দোর খুলে। অমলেশের হাত ধরেই সে এ-বাড়িতে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু নিয়তির অমোঘ ইচ্ছা অন্যরূপ।

এলো সে পুলকেশের হাত ধরে। পুলকেশ সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচের মানুষ। সে অমলেশ নয়। কমলের অন্তরাত্মা গুমরে কেঁদে উঠল। তার জীবনের রঙিন আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলোয় মিশিয়ে গেল।

কিন্তু উপায় কি? বিধাতা তার বিরূপ। ভাগ্য তার চক্রান্ত করে তার উপর এই অবিচার করল। চাপিয়ে দিল তার উপর এই অপমানের বোঝা। এই ব্যর্থতার গ্লানি বুকে চেপে তাকে মুখ বুঁজে সইতে হল এই দুর্বহ জীবনভার। সে তো উপন্যাসের নায়িকা নয় যে এই নিয়ে একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারনা করবে।

নীরবে, নিঃশব্দে, নিরুপায় হয়ে সে ভাগ্যকে মেনে নিল। ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে তো কোন ফল নেই। স্বামী হিসাবে পুলকেশ তার কাছে অবাস্তব হয়ে রইলো। সে সান্ত্বনা খুঁজলো পুলকেশের বিপুল ঐশ্বর্যের মাঝে, এই বিশাল সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে। সংস্কার ও নীতির দিক থেকে সে স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করল।

কমলের বিদেশ যাওয়া আপাতত স্থগিত রইলো। বিদেশ থেকে এই দীর্ঘ দিন পরে অমলেশ বাড়ি ফিরছে. এ সময় সংসারের গৃহিনী কমলের বাইরে যাওয়া অশোভন বই কি বাড়ির ছেলে. সংসারের একজন এবং যৌথ সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক।

বিপাশা মনে মনে হাসে। আর ভাবে। কমলের মুখে সে একটা নতুন আলোর দীপ্তি দেখেছে। অমলেশের ছবি আর তার আগমন সংবাদ তাকে রীতিমত আলোড়িত করে তুলেছে। তার সলতেপোড়া স্তিমিত প্রদীপে তেল যুগিয়েছে। সে জ্বলে উঠেছে সে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তার জীবনের ভবিষ্যৎ যেন একটা প্রত্যাশায় কুয়াশা-মুক্ত প্রভাতবেলার মত শুভ্র আর সুন্দর হয়ে উঠেছে।

বিপাশার মনে ভরা যৌবনের মদির আবেশ। সে বুঝতে শিখেছে সে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে কমলের মুখপানে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবে। অবাক হবারি যে কথা। এমন যে রাশভারী কঠিন মেয়ে রাঙাপিসী তারও বিবাহিত মনের গোপনে, স্বামী ছাড়া অন্য এক সুন্দরের স্নেহস্পর্শরস পুষ্পিত হয়ে আছে। কৌশোরের প্রেম, প্রথম প্রেম ভোলা যায় না। অথচ এই প্রথম প্রেমে নাকি ভগবানের বিষদৃষ্টি আছে। মিলন ঘটে না। কেন?

কমল বলে, কী ভাবছিস রে বিপাশা। বিদেশ যাওয়া হলো না বলে মন খারাপ হয়েছে নাকি?

—হলেই বা উপায় কি? তুমি যখন যাবে না।

—যাওয়া কি উচিত? তুই বল না?

—না। এখন যাওয়া চলে না। এতোদিন পরে বাড়ি ফিরবে, আদর অভ্যর্থনা করবে কে? বাড়িতে এসে দাঁড়াবে কার কাছে?

—ঘরের ছেলে ঘরে আসছে, এক যুগ পরে। কোন সাত সমুদ্দুর তেরো নদির পার থেকে! আমি ঘর-সংসার ছেড়ে বিদেশ গেলে সে ভাববে কী বলতো? পাঁচজনেই বা বলবে কী?

—তা সত্যি। উনি আসুন। তারপর গেলেই তো হবে।

দুজনে দুজনার পানে চেয়ে অভিভূতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। কী যেন খুঁজছে। কী যেন ভাবছে।

কমল মৃদু হেসে বলে, তোর পিসেবাবুর একটু রাগ রাগ ভাব।

হেসে ওঠে বিপাশা। কমল উৎসুক দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চায়।

বিপাশা দৈবাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা রাঙাপিসি তুমি যে ওঁকে ভালোবাসতে পিসেবাবু জানেন?

কমল ঝলসে ওঠে, কে বললে আমি ওকে ভালোবাসতুম?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে কুণ্ঠিতস্বরে বিপাশা বলে, তুমি যে বললে—

—না। আমি বলিনি।

রুক্ষ প্রতিবাদের কণ্ঠে কমল উত্তর দিল।

বিপাশার মুখের দীপ্তি নিভে যায়। ছলছল চোখে সে স্তব্ধ হয়ে মাথা নিচু করে।

কমল খিল-খিল করে সশব্দে হেসে উঠে বিপাশাকে বুকের মাঝে টেনে নেয়। তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বিহ্বল গলায় বলে, ছেলেবেলার ভালোবাসার কোন মানে হয় না রে বিপাশা। খেলা কখনো সত্যি হয় না।

কমলের গলার স্বরটা কান্নার মত শোনায়। তার চোখের পাতাগুলো ভিজে ওঠে। বিপাশা মুখ তুলে তার পানে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে, খেলা সত্যি না হলেও খেলার মাঝে সত্যিকার জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়।

বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে কমল তার মুখের পানে তাকায়।

বিপাশা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে ওঠে, তোমার বুকের নিচে যে ব্যথার সমুদ্র রাঙাপিসি!

কমল ত্রাস্তে বিপাশার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, ওরে বলতে নেই। চুপ কর। তোর পিসেবাবু কি আমাকে কম ভালোবাসে।

বিপাশা বলে, ছেলেবেলার ভালোবাসা, জীবনের প্রথম প্রেম যে ভোলা যায় না রাঙাপিসি!

কমলের মোমের মত বিবর্ণ গাল গড়িয়ে অশ্রুর ধারা নামে।

বিপাশার বুকের নিচেটা একটা অসহ্য ব্যথায় টনটন করে।

কমল এই পিতৃমাতৃহারা ভাইঝিটিকে অকপট স্নেহ দিয়ে বিয়ের পর থেকে লালন করে আসছে। কমলের বিয়ের সময় মোটর দুর্ঘটনায় বিপাশার বাবা ও মা এক সঙ্গে নিহত হন। তারপর থেকে সে কমলের কাছেই আছে। বিপাশা কমলের একান্ত অনুগত।

বোম্বাই হয়ে অমলেশ কলকাতা এসে পৌঁছল। কিন্তু বাড়িতে এসে না উঠে, উঠলো সে গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

কমল মুষড়ে গেল। তার এত পরিশ্রম, এত আয়োজন সব পণ্ড হলো। বিকেলে একবার বাড়িতে এসে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে গেল অমলেশ।

কমলকে বললে, বাড়িতে আসতে ভরসা হলো না। একলা হলে এখানে আসতে কোন আপত্তি ছিল না। সঙ্গে রয়েছে একটি মহিলা।

— কে মহিলা? বিয়ে করেছো নাকি?

অমলেশ হাসল। বললে, না। এখোনো সে পর্যায়ে উঠিনি।

কমলের মুখখানা মুহূর্ত আরক্ত হয়ে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে পাংশু হয়ে গেল। বিষণ্ণ, চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলে, উপস্থিত তুজনের সম্পর্কটা কী রকম ?

অমলেশ সশব্দে হেসে উঠলো : অর্থাৎ জানতে চাইছো সম্পর্কটা মধুর কি না ?

অমলেশের হাসির তোড়ে কমল মিইয়ে গেল। সে অবশ আচ্ছন্ন গলায় বললে, হ্যাঁ।

অমলেশ হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বললে, প্রায় কাছাকাছি। বান্ধবী বলতে পারো। গার্ল বলতে পারো। ও-দেশে নিঃসম্পর্ক তুটি নরনারীর একত্র বসবাসে কোন অন্তরায় নেই। নিন্দার্হ ও নয়।

কমল মৃত্বহেসে বললে, অর্থাৎ ভাবী বা মনোনীত স্ত্রী ?

—ঠিক বলা যায় না। দুজনের কেউই এখনো সে কথা ভাবিনি।

—অথচ তুজনে একত্রে বসবাস করছো ?

—তা করছি বই কি।

কমল চোখের কোণ দিয়ে তার পানে চেয়ে বললে, পছন্দ হয়ে থাকে তো বিয়ে করো না। মেয়েটি কেমন ? আমাকে দেখাবে না ?

—হোটেলে এসো না একদিন। কাল বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন রইলো।

কমল চোখে ঝিলিক নিয়ে বললে, তুমি এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তোমার কনে দেখাতে তুমি নিয়ে যাবে না ?

অমলেশ হাসতে হাসতে আনত ভঙ্গিতে বললে, তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য। তোমার সাম্প্রতিক পদমর্যাদাকে নিশ্চয় আমাকে সম্মান দিতে হবে। তুমি আমার পূজনীয়া।

একটা শীতল বিষণ্ণতায় কমলের শরীরটা কেঁপে উঠলো। তার মনে হলো এক পরাক্রান্ত শত্রু এতক্ষণ তাকে আক্রমণের পথ খুঁজছিল। পথ খুঁজে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে সে যেন হিংসালু হয়ে উঠেছে। কমল আত্মরক্ষা করবার মত কোন অস্ত্র খুঁজে পেল

না। তার সম্মুখীন হবার সাহস পর্যন্ত হলো না। অথচ তার আক্রমণের ভঙ্গিতে এমন একটা বিহ্বল মাদকতা ছিল যা মুহূর্তে কমলকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে ফেললে।

কমলের মলিন ও ম্রিয়মান মুখ দেখে অমলেশ আবার একটা হাসির ঢেউ তুললো। তার হাসির দুরন্ত বাতাস যেন কমলকে অনাবৃত করে দিল সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়েও নিজেকে সোজা করে তুললো। কণ্ঠে শক্তি সংহত করে সুস্পষ্ট সতেজ গলায় বললে, হাসির কি আছে? বড়োকে বড়োর সম্মান দিতে হবে না? আমি যে তোমার বড় এ-কথা কি আমায় মুখে বলে দিতে হবে নাকি?

—মুখে কেন বলবে চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি। আমি যখন যাই তখন বোধ হয় তুমি ফ্রক পরতে। এখন তো একেবারে মাদাম দ্য পুলকেশ। বিপাশা খিল খিল করে হেসে উঠলো। কমল মুখে আঁচল চেপে বললে, ঢঙ!

হোটেলে মেয়েটির সঙ্গে কমল ও বিপাশার পরিচয় করিয়ে দিল অমলেশ। মেয়েটি য়ুরোপীয় নয়। এদেশী। য়ুরোপীয় পরিবেশে প্রতিপালিত। মারাঠি মেয়ে। নাম লীলা ভোঁসলে। লণ্ডনের বিলেতি আবেষ্টনে মানুষ হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে। জ্ঞান হবার পর ভারতে আসেনি। তাই এসেছে পৈতৃক আবাসভূমি দেখতে। চমৎকার সুশ্রী মেয়ে। দীঘল ছিপছিপে ফুলন্ত লতার মত তনু দেহ। গায়ের রঙ শুভ্র। হিমেল হাওয়ায় শুভ্রতর হয়েছে। চিনে কালিতে তুলি দিয়ে আঁকা সরু দুটি ভুরু। দীর্ঘায়ত চোখদুটিতে আলো ঠিকরে পড়ছে। মাথার চুলগুলি খাটো করে ছাঁটা। সুকোমল নিটোল গ্রীবার উপর লুণ্ঠিত। কালো ও কপিশ রঙের অপূর্ব সংমিশ্রণ চুলের মাঝে। মুখের মাধুর্যর সঙ্গে মিশে আছে মারাঠির নির্ভীকতা। লীলাও নাকি খুব উঁচু স্তরের আর্টিষ্ট। অমলেশের প্রতি তার আনুগত্য শিষ্যা ও সখির মত।

বিপাশার ভালো লাগে লীলাকে। সত্যই মেয়েটি এমন শান্ত,

সজীব ও উৎসুক যে তাকে ভালো লাগবারই কথা। এর শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতার অন্তরালে যে দুঃসাহসিক প্রণয়াসক্ত হৃদয় তা এদেশের সমাজ সংস্কারের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে। বিপাশার মনে হয় এর মাঝে অন্যায় কিছু নেই। এদের প্রেমের মাঝে গোপনতা নেই। এদের মনে বিচিত্র রঙের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য। রৌদ্রোজ্জ্বল অবারিত আকাশের মত এদের প্রেম, মুক্ত, স্পষ্ট ও স্বাধীন। লোকলজ্জা ও লোকনিন্দার ভয়ে ওরা আদিম স্বাধীন বৃত্তিকে শৃঙ্খলিত করেনি। বিপাশা ভাবে নাইবা হোল দুটো মন্ত্রপাঠ, নাইবা বাজলো লোকাচারের শঙ্খঘণ্টা। সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে যদি দুটি মনের অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে উঠে, সে প্রেম কলুষিত নয়।

•

একান্তে অমলেশ এক সময় কমলকে জিজ্ঞেস করলে, কী রকম লাগছে এই দাম্পত্য জীবন? পাঁচ বছরেই তো যৌবনকে ফুরিয়ে দেউলে করে এনেছো। প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে পতিসেবা করছো। পতিব্রতা বলতে হবে।

কমলের চোখে দপ করে একটা শিখা জ্বলে উঠেই নিভে গেল। হঠাৎ হাত কেঁপে কাপ থেকে এক ঝলক চা চলকে ছিটিয়ে পড়ল, তার দামি শাড়িখানার উপর।

অমলেশ ত্রাস্তে ন্যাপকিন দিয়ে শাড়ির চা-টা মুছে দিতে দিতে অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বললে, ছি ছি! একটা ফান করতে গিয়ে তোমার শাড়িখানা নষ্ট করে দিলাম। কী করলুম বলোতো?

—বেশ করলে।

কমল শাড়ির উপর থেকে অমলেশের হাতখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে নিজের মুঠোর ভিতর শক্ত করে তার হাতখানা চেপে ধরল। তার উচ্ছ্বসিত তপ্ত স্পর্শ কমলের সর্বাঙ্গে আগুন ছিটিয়ে দিল। সে কম্পিত খাটো গলায় বললে, আমার দুর্ভাগ্যকে নিয়ে ফান্ করতে তোমার লজ্জা করে না? এতো নিষ্ঠুর তুমি হলে কেমন করে?

অমলেশ পাইপটা দাঁতে চেপে ধরে বললে, আমাকে তো এরি মধ্যে তোমার ভুলে যাবার কথা নয়। আমি তো চিরদিনই নিষ্ঠুর। আমার নিষ্ঠুরতার জন্যে দুজনে আমাদের কতো ঝগড়া হয়েছে। তুমি বলতে পুরুষ সুন্দর হলেই নিষ্ঠুর হয়। ভুলে গেছো?

কমল তার চোখে চোখ রেখে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলো, ভুলিনি আমি ভুলিনি। তুমিই—

তার গলার স্বর বুঁজে এলো। চোখ দুটি অশ্রুতে আকুল হয়ে উঠলো।

অমলেশ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে গোপন কথা বলা বলার ভঙ্গিতে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, তোমাকে দেখে সুখি মনে হচ্ছে না কমল!

—মনে হচ্ছে না? তাই নাকি? ফিকে ব্যঙ্গের হাসিতে তার ঠোঁট দুখানা থর থর করে কেঁপে উঠলো।

অমলেশ বললে, নিজের সঙ্গে তুমি নিজেই শত্রুতা করচো।

সপ্রশ্ন সকাতর দৃষ্টিতে কমল তার পানে তাকাল। অমলেশের পেশল দেহের শুভ্র শোভায়, আবেগ কম্পিত দর্পিত কণ্ঠস্বরে, অনমনীয় চোখের দৃষ্টিতে, কালো ভুরুর সংলগ্ন রেখায় কমল সম্মোহিত। বিসর্পিল কামনা তার দেহের শিরা উপশিরায় লেলিহান হয়ে উঠেছে। তার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত।

অমলেশ পাইপে তামাক দিতে দিতে বললে, তোমরা বিয়ে করো স্রেফ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। জীবনের আস্বাদ পাবার জন্যে বা প্রেমের জন্যে নয়। কাজেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মত বিয়ের নাগপাশে যাকে বেঁধেছো তাকেই রক্ষা করে, তারই মাঝে মধুর সন্ধান করো। বিয়ে, গয়না আর দেনা-পাওনার হিসেব, এরই মাঝে তো তোমাদের প্রেম?

—তবে কি তোমার মত বিয়ে না করেই প্রেম করতে বলো?

হেসে ওঠে অমলেশ: আমাদের কথা বাদ দাও। আমাদের

প্রেম বন্যার প্লাবন। কাল-বোশেখির ঝড়। সামাজিকতার বহু উর্ধ্বে তার গতি। অনেকটা এ দেশের বৈষ্ণব প্রেমের মত নিছক একটা উন্মাদনা।

মোহাবিষ্টের মত কমল নিঃশব্দে তার মুখপানে চেয়ে আছে। বোঝা যায় না তার নিশ্বাস পড়ছে কিনা। একটু থেমে অমলেশ বললে, বিবাহিত জীবন সুখের হলো না বলে, জীবনকে, যৌবনকে তুমি বঞ্চিত করতে পারনা। বঞ্চনার ক্ষোভ আর বেদনাময় নিষ্ফলতা বয়ে যৌবনের হৃদয়াবেগকে শান্ত করা চলে না। সে তো এক ধরনের মৃত্যু।

— না চললে উপায় কি?

স্বপ্নের ঘোরে যেন কথা বললে কমল। স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মত তাকিয়ে রইলো তারপানে।

অমলেশ বললে, বাঁচতে হলে, উপায় নিজেকে করে নিতে হবে। মনের মত প্রণয়ী খুঁজে নেওয়া যা ও-দেশের মেয়েরা করে। প্রেমের জন্যে, জীবনের জন্যে, এমন কারুর শরণাপন্ন হওয়া যে তোমার প্রেমের সত্যিকার মর্যাদা দেবে। জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুলবে।

কমলের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। নিজের সম্বন্ধে এ রকম নিদারুণ লজ্জাকর মন্তব্য শুনতে এ-দেশের কোন মেয়েই অভ্যস্ত নয়। কেউ এ রকম ইঙ্গিত করতেও সাহস করবেনা। কিন্তু অমলেশের তীক্ষ্দৃষ্টিতে যেন তার গোপন মনের চেহারাটা ধরা পড়েছে। সে তাকে লজ্জা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। তার নিগূঢ় সত্তাকে যেন ঝাঁকানি দিয়ে সে কাঁপিয়ে তুলেছে।

অমলেশের মুখের পানে লজ্জায় সে চোখ তুলে চাইতে পারলে না। বিকারগ্রস্ত মনের অসংলগ্ন চিন্তাকে চাপা দেবার জন্যই সে নতমুখে মৃদু হেসে বললে, যেমন দুরন্ত আর দুষ্টু ছিলে, ঠিক তেমনি আছ। একটুও বদলাওনি।

অমলেশ হেসে উঠলো। চিরদিনই সে সহজ ও হালকা প্রকৃতির।

মনে যা আসে, মুখে বলতে তার বাধে না। তার মাঝে গোপনতা নেই। মন তার উন্মুক্ত আকাশের মত বাধাবন্ধহীন।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে অমলেশ বললে, আমার অপরাধ তোমাদের ব্যথায় আমি বেদনা বোধ করি। তোমাকে অপমান করবার জন্যে বলিনি। সতী সাধ্বীর মত স্বামীকেই যদি পরমপুরুষ ভেবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো, ওয়েল অ্যাণ্ড গুড। মরণের পর অক্ষয় স্বর্গ হবে।

অমলেশ আবার সশব্দে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দ সোজা ফলার মত কমলের হৃদপিণ্ডে গিয়ে বিঁধলো।

॥ তিন ॥

পুলকেশ কমলকে বললে, অমল সম্পত্তি বখরা করে নিতে চায়।

কমল মুখ না তুলই গম্ভীর হয়ে বলল, এ আর নতুন কথা কি? চাইবেই। এতোদিন বিদেশে ছিল বলেই চাইতে পারেনি। নইলে অনেক আগেই চাইতো।

পুলকেশ বললে, সম্পত্তি পেলেই কিন্তু ও নষ্ট করে ফেলবে। বেচে কিনে টাকা নিয়ে আবার সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

কমল মুখ তুলে হাসল মৃদু রেখায়। বললে, সমুদ্দুরে পাড়ি দেবে কি শূন্যে উড়বে সে কথা ভাবার তো আমাদের দরকার নেই। তার সম্পত্তি সে যা খুশি করবে, তাতে আমাদের বলবার কী আছে?

পুলকেশ কমলের কাছে কোন উৎসাহ না পেয়ে বেশ একটু দমে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বেশ ঝাঁঝালো গলায় বললে, পৈতৃক বাস্তু কিন্তু আমি ভাগ করতে দোব না।

—তার মানে?

সংশয় বিচলিত কালো চোখদুটি বড় বড় করে সে পুলকেশের পানে তাকাল।

পুলকেশ বললে, তার অংশ আমাকে বেচে দিক।

কমলের মুখখানা শক্ত হয়ে উঠলো। তার চোখদুটো জ্বলে উঠলো। পুলকেশের পানে চেয়ে তার মনে হলো যেন তার মুখ থেকে মুখোস খসে পড়েছে। তাকে যেন অত্যন্ত কুশ্রী আর কদর্য দেখাল। তার মুখের চেহারা গেছে বদলে। কমল রূঢ়স্বরে বললে, সে-ও তো বলতে পারে তোমার অংশ তাকে তুমি বেচে দাও। সে কিনবে।

একটু ভেবে পুলকেশ জবাব দিল, চলতি ব্যবস্থায় পৈতৃক ভিটে বড়োর প্রাপ্য। আমি বড়ো। বংশের উত্তর সাধক।

অনেকক্ষণ তুজনের কথা কাটাকাটি চললো। কমল একসময় বললে, ছোট বাড়ি বিক্রী করতে রাজি হলেও তাকে দাম দেবার মত টাকা তোমার নেই। দিতে হলে অন্য সম্পত্তি বেচতে হবে।

পুলকেশ মুখখানা শক্ত করে বলে উঠলো, সে ভাবনা আমার।

কমল হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলো। বললে, তোমার সব ভাবনার যে শাস্ত্রমতে আমায় অর্ধেক ভাগ নিতে হয়। সে-কথা ভুলে যাও কেন?

এক ফুঁ-য়ে পুলকেশকে নিবিয়ে দিল কমল। সে অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করলে।

কমল বললে, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করা মিছে। চাবিকাটি দিয়েছো যে আমার হাতে।

আপোষের সুরে পুলকেশ বললে, আমাদের পারিবারিক সমস্যা তোমার কাছে লুকোবো কেন?

কমল বেশ যুক্তির সঙ্গে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললে, ছোট-র ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে এ-সব সমস্যাগুলো নির্ঘাত দেখা দেবে, এ-কথা আগেই তোমাকে বলেছিলুম।

—সে-কথা আমিও জানতুম। কিন্তু সে যে এখানে পা দিয়েই এই সব অশান্তির সৃষ্টি করবে তা ভাবিনি। বিশেষ তোমার শরীরের ভাবনায় আমার মাথা খারাপ হয়ে আছে। এ সময় এই সব ঝামেলা ভারি বিশ্রী লাগে। নইলে এতো জানা কথা।

কমল একটা কুটিল প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে পুলকেশের পানে এমনি ভাবে তাকাল যে সেই প্রচ্ছন্নতার ঘন অন্ধকারে পুলকেশ মুখ লুকোবার একটু ঠাঁই খুজে পেলে না।

একটি তরুণী হঠাৎ ঢুকেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বোধ হয় পুলকেশকে দেখে।

কমল ডাক দিল, এস নিতা।

মেয়েটি তাদের দুজনকে নমস্কার করে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। সুশ্রী, সুবেশা তরুণী। মেয়েটির হাঁটার দৃপ্ত ভঙ্গিটি চমৎকার। পরনের ফিকে সাগর রঙের শাড়িখানিতে তাকে সুন্দর মানিয়েছে। তার কালো ডাগর চোখ দুটির পানে তাকালে মনে হয় সে ক্লান্ত।

মেয়েটির নাম অনিতা। কমল তাকে 'নিতা' বলে ডাকে। বিপাশাকে গান শেখায় অনিতা।

—বিপাশা কোথা?

অনিতা প্রশ্ন করল।

কমল তাকে বসতে বললে ,এখুনি আসবে— একটু বসো।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলে, কোথায় গেছে সে?

— ছোট-র ওখানে। গ্র্যাণ্ড হোটেলে। লীলা কাল নাগপুরে যাচ্ছে, তাই দেখা করতে গেছে।

মুখখানা বিকৃত করে পুলকেশ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অনিতা কথা বলে উঠলো। পুলকেশের বলা হলো না।

— আপনার শরীর কেমন? কবে চেঞ্জে যাচ্ছেন?

কমলকে প্রশ্ন করলে অনিতা।

উত্তর দিল পুলকেশ: সেই কথাই হচ্ছিল। ডাক্তার তাড়া দিচ্ছে কিন্তু ওঁর মন উঠছে না সংসারের হাল ছেড়ে যেতে। পাছে ওঁর সংসার বানচাল হয়ে যায়। অবিশ্যি উনি বাড়ি ছেড়ে গেলে, অসুবিধে আছেই, কিন্তু শরীর আগে তো?

অনিতা হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বললে, মেয়েদের মন আপনারা ঠিক বুঝবেন না স্যার! তাদের দায়িত্ব, বিশেষ করে এই সংসারের ওপর তাদের মমত্ববোধ তাদের অস্থিপঞ্জর। তারা সে দায়িত্ব বয়ে বেড়ায় দেহের শক্তি দিয়ে নয়। মনের ঐশ্বর্য দিয়ে। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা ভাববার সময় পর্যন্ত তারা পায় না। সংসারের জন্য প্রিয়জনের জন্য তারা দেহপাত করে। জীবনপাত করে।

কমল বললে, ওঁরা সে কথা ভাবেন না নিতা। ওঁরা ভাবেন সংসার চলে পয়সায়। সংসার চালায় ব'মুন চাকরে।

অনিতা মধুর হাসিতে মুখ ভরে ঘাড় দুলিয়ে বললে, ওরা হয়তো তাই ভাবেন। কিন্তু এর অন্যদিকটাও ভাবতে হবে। যাঁদের সেবায় শরীর পাত করছেন, তাঁদের মুখ চেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শরীরকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে হবে। ভাঙ্গা শরীর নিয়ে অসুস্থ মন নিয়ে প্রিয়জনের কোন কাজে লাগবেন?

অনিতা একালের শিক্ষিতা মেয়ে। কথাগুলি যেমন মিষ্টি গলার স্বরটি ও তেমনি মোলায়েম. সংযত ও ধীর। বলবার ভঙ্গিটি ও অপরূপ। পুলকেশ প্রসন্ন মুখে তার পানে চায়। এতো কাছ থেকে আর কখনো তো তাকে দেখবার সুযোগ হয়নি। তাকে ভাল লাগলো।

কমলের মন অনিতার প্রতি দাক্ষিণ্যে উদ্বেল। তার মনে হয় ওর মনের ঐশ্বর্য অভাবের ঝাঁজে ঝিমিয়ে যায় নি। কথাবার্তা, হাবভাবে সজীবতা আছে, একটা স্নিগ্ধতা আছে। কমল প্রথম থেকেই মেয়েটিকে স্নেহের চোখে দেখেছে। অনিতাও তাকে শ্রদ্ধা করে।

বিপাশাকে গান শেখাতেই এ বাড়িতে অনিতার প্রথম আগমন। সম্প্রতি সে কমলের অনুকম্পায় প্রমোশন পেয়েছে তাদের একটা কোল কোম্পানীতে সেক্রেটারীর কাজে। বিপাশাকে গান শেখানোটা এখন তার উপরি পাওনা।

অনিতা কমলের সমবয়সী হলেও সে তাকে প্রভু-পত্নীর মর্যাদা দেয়। বন্ধুতার দাবি করে না। কমলকে সে বউরাণী বলে ডাকে।

অনিতা বরং বিপাশার বন্ধু বিপাশার সঙ্গে সে প্রাণ খুলে মেলামেশা করে।

প্রথম দিনই অনিতা বিপাশাকে বলেছিল, তুমি বউরাণীর ভায়ের মেয়ে। এ বাড়ির সঙ্গে তা হলে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই।

বিপাশা চোখ উল্টে ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছিল, রক্তের সম্বন্ধ না

থাকলেও স্নেহের সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের জোরেই আমি বাড়ির একজন।

অনিতা কুটিল চোখে তার পানে চেয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, তা ঠিক। গিন্নীর কুকুর কর্তাকে ভালোবাসতেই হবে।

বিপাশার মুখখানা রীতিমত শক্ত হয়ে উঠেছিল। জ্বলন্ত আগুনে চোখে সে তাকে ভস্ম করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অনিতা দৈবাৎ আগুনকে বুকে টেনে নিয়ে বাহুর বেড় দিয়ে কণ্ঠমালা রচনা করল। আগুন একমুঠো ফুলের মত তার বুকে ঝরে পড়ল। দুজনে একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল।

অনিতার সঙ্গে বিপাশার আলাপ জমে উঠলো। বুনো ফুলের মত অনিতার রূপে একটা চমক আর মাদক সৌরভ আছে। চোখকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। মনে নেশা ধরায়।

অল্পদিনের মধ্যেই বয়সের ব্যবধান আর সম্পর্কের দূরত্ব পেরিয়ে দুজনে কাছাকাছি হল।

কমল ফুরিয়ে গেছে। শরীরের মাঝে ফুরিয়ে গেছে। শীতের নিস্পত্র গাছের মত। মন হারিয়ে গেছে অনুভূতির জটিল অন্ধকার গহনে। শরীরে তার আত্মদহনের অঙ্গার কালিমা। মনে তার আদিম শূন্যতার হাহাকার।

নিজেকে তার অবান্তর আর নিরর্থক মনে হয়। বিবাহিত জীবনের গ্লানিকর চিন্তা তার সজ্ঞান অস্তিত্বকে মিথ্যা করে দেয়। একটা শ্বাসরোধী দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা তার নারীত্বের চেতনাকে অবশ ও অসাড় করে তোলে। নিজেকে তার মিথ্যা মনে হয়। তার এই বিবাহকে জীবনের সব চেয়ে শোকাবহ কলঙ্কিত ঘটনা মনে হয়। এই বিবাহ অনুষ্ঠান তাকে মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি করেছে। তার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছে।

না। জীবনে আশার ক্ষীণতম আলোর রেখাটি নেই। সুদূর কোন

সম্ভাবনা নেই। সে ফুরিয়ে গেছে। সে নিভে গেছে। জীবনে সে নিজেকে উচ্চারণ দিতে পারল না। নিজেকে প্রকাশ করতে পারল না। পরের ইচ্ছার ভারবাহী হয়ে সংসারের চাকায় ঘুরে বেড়াল।

এই কি নারী জীবনের পরমার্থ নাকি? নিশ্চিত নিশ্চিন্ততাই কী যৌবনের প্রত্যাশা? শরীরে দুর্বহ আলস্য, ঐশ্বর্যের দাসত্ব আর প্রাণহীন সংসারের কর্তৃত্ব এরি মাঝে কী কামনাময় জীবনের চরিতার্থতা? তারি মাঝে কি পরম ক্ষুধার নিবৃত্তি?

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কমল অতীতের বাতায়ন খুলে দূর দুর্নিরীক্ষ্যের পানে চেয়েছিল। কত সুন্দর কত শুভ্র আর কত মদির ছিল সে দিনের সেই পৃথিবী। তার আকাশে ছিল তারার কবিতা। বাতাসে ছিল ফুলের গান। আলোয় ছিল স্বপ্নের উৎসব। তার কুমারী মনের মসৃণ বৃন্তে ফুটতো অনাঘ্রাত কামনার ফুল। শরীরে জাগতো একটি ভীরু পিপাসা। একটি ঘুমন্ত অভিলাষ। হৃদয়ের সেই অবচ্ছিন্ন অন্ধকারের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল অমলেশের জন্য একটি বিশেষ আসন। একটি কম্পিত প্রতীক্ষা। এ বাড়িতে আসার পেছনেও প্রচ্ছন্ন ছিল অমলেশের প্রেরণা। কাছের অমলেশ দূরে সরে গেলেও, পুলকেশের পত্নীত্বের বন্ধন স্বীকার করলেও সে অমলেশকে হৃদয় থেকে সরিয়ে দিতে পারলে না। অমলেশের জন্য তার প্রতীক্ষার আসন রইলো পাতা। তার সংস্পর্শের উত্তাপ রইলো সুষুপ্ত তার দেহের নিভৃত তটে। সে ভুলতে পারল না অমলেশকে। আচমকা অতর্কিতে পুলকেশের ছায়া দেখে অমলেশের স্মৃতি উঠতো সজাগ হয়ে। বহুদূর থেকে ও সে প্রচণ্ড আকর্ষণে তাকে কাছে টেনে নিত। তারপর এই দীর্ঘ দিন পরে তাকে দেখেই তার মনে হল সে একে ভোলেনি। ভুলতে পারেনি। একে ভোলা অসম্ভব। সে শূন্য চোখে উদাস দৃষ্টিতে কড়িকাঠের পানে চাইলো। নিজের বুকের ধকধকানির মাঝে শুনতে পেলে অন্তর্বাণীর প্রতিধ্বনি : ওকে ভোলা অসম্ভব।

বিপাশা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে তার কপালে হাত রাখল।

তার পানে তাকাতে গিয়ে কমলের চোখদুটি ছলছলিয়ে এলো।

বিছানায় উঠে বসে বিপাশা বললে, শরীর তো ভালো নেই।

কমল উঠে বসলো। এলো চুলগুলো জড়াতে জড়াতে ঘুমন্ত গলায় প্রশ্ন করলে, বাইরে কি মেঘ করেছে রে?

—এক পশলা বিষ্টি হয়ে গেল। বিপাশা ঘরের জানালাগুলো খুলে দিল। শরতে মেঘলা আকাশে মুমূর্ষুর অন্তিম হাসির মত এখনো আলোর ক্ষীণ রেখা।

আঁচলটা টেনে গায়ে জড়াতে জড়াতে কমল বললে, শীত শীত করছে। মাথাটা একটু ভারিও হয়েছে।

বিপাশার চোখদুটি আকুল হয়ে কমলার মাঝে কী যেন হাতড়াতে থাকে। এই সুন্দরী মেয়েটির ম্রিয়মান মুখের নিরুপায়তায় বিপাশার মনে একটা দুর্বোধ বিভীষিকা জাগে। তার মনে হয় বিবাহিত জীবনের জটিল দুর্গম অরণ্যে সে পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে।

বিপাশা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে ভাঙাগলায় বললে, দিনরাত মুখবুজে এমন করে শুয়ে শুয়ে ভাবলে শরীর ভালো থাকবে কেমন করে?

কমল নিঃশব্দে বিপাশার মুখের উপর থেকে উড়ো চুলগুলো সরিয়ে দিল। রক্তহীন শুকনো ঠোঁটে ফুটে উঠলো সূক্ষ্ম হাসির রেশ। বিপাশার কাছে দুর্বোধ্য সে হাসি। সে হাসির মাঝে অপরিসীম ক্লান্তি আর অপার শূন্যতা। বিপাশা অগাধ অসহায় চোখে তার পানে চায়। রাঙাপিসীই এ বাড়ির প্রাণ। তার দর্পিত পদক্ষেপে, তার কণ্ঠের ঝঙ্কারে, তার বিচ্ছুরিত হাসির তরঙ্গে, তার আদেশের কাঠিন্যে এ সংসার প্রাণের স্রোতাবেগে চঞ্চল ও অধীর হয়ে ওঠে। সেই প্রাণ-চঞ্চল মেয়েটির এই বিষণ্ণ ভেঙে-পড়া ভঙ্গি দেখে বিপাশা একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

কমল বললে, বাইরে যাই চল বিপা। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বিপাশা সাগ্রহে বললে, তাই চলো রাঙাপিসি। পশ্চিমে শীতটা কাটাতে পারলে তুমি সেরে উঠবে।

—সেরে আর উঠবো নারে বিপা। এ রোগ সারে না। হাড়ে ঘুন ধরেছে! নাই সারুক। তবু এখান থেকে আমায় নিয়ে চল। এখানে আর আমি থাকতে পারচি না।

আকাশ আবার ঘোর করে এসেছে: দমকা বাতাসের আর আচমকা বিদ্যুতের সঙ্গে শরতের মেঘের গর্জন ঘরের বিষণ্ণ পরিবেশকে বিষণ্ণতর করে তুললে। খোলা জানালার বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে রাশীভূত হয়ে বসে কমল লীলাচঞ্চল মেঘের ভ্রুকুটি দেখতে লাগল।

দৈবাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমল আপন মনে বুঝিবা নিজের অজ্ঞান্তে বলে উঠলো, এই হলো জীবনের আসল রূপ।

বিপাশা চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকাল। অপ্রস্তুতের ম্লান হাসি হাসল কমল।

বিপাশা বললে, সত্যিই তাই। বিদ্যুতের ঐ ঝলকানি দূরপথের ইঙ্গিত দেয়। হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঘর বাঁধাই প্রেমের শেষ কথা নয়।

বিদ্যুতের চমক-লাগা চোখে দিশেহারার মত বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে কমল বিপাশার পানে তাকাল।

বিপাশা তার হাতদুটো ধরে, অনুনয়ের সুরে বললে, মত আর বদলো না রাঙাপিসি। যাবার ব্যবস্থা করো।

—তা ছাড়া উপায় নেই রে বিপা। বাইরের পানে চেয়ে কমল আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

কমলের নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ ও অবসন্ন মনে হয়। একটা প্রচণ্ড ঝড়ে যেন তার জীবনের শিকড় উপড়ে গেছে। নিজের কাছেই নিজে যেন অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। বাইরের এই পরিচিত পৃথিবী যেন তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না।

সংসারের কুঞ্চিত ললাটে একটা ঝড়ের পূর্বাভাব। সম্পত্তি নিয়ে

দু'ভায়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত আসন্ন। সব জেনে শুনেও কমল নির্লিপ্ত। নির্বিকার। সংসারের জন্য যে মমতাটুকু শেষ সূর্যরশ্মির মত মনের আকাশপ্রান্তে ঝিকমিক করতো সে-টুকুও গভীর বিতৃষ্ণায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পুলকেশ তাকে অন্ধকূপে বন্দিনী করে রেখেছে। সত্যকার অনুরাগ মনে না থাকলেও দাম্পত্য ধর্মের মর্যাদা রাখতে এতোদিন সে তার যৌবনের ক্ষুধা মিটিয়েছে। সে চোখ মেলে চায়নি। আজ সে দিনের আলোয় চোখ মেলে নির্লজ্জের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রেমহীন আত্মসমর্পণের গ্লানিতে তার দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। নিজেকে তার অশুচি ও কলঙ্কিত মনে হয়।....

পুলকেশের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যাবার জন্যই এখান থেকে সে পালাতে চায়।

॥ চার ॥

শিমুলতলায় নিজেদের বৃহৎ বাড়ি। সরকার মালি, চাকর সব আছে। সেইখানেই যাওয়া কমলের ঠিক হলো। বিপাশা যাবে সঙ্গে। কমল অনিতাকে সঙ্গে নিতে চাইল। সঙ্গি হিসেবে অনিতা চমৎকার। তার তরুণ মনের হালকা হাসি-গান দিয়ে হয়তো সে তার জীবনের বেদনাময় স্তব্ধতাকে মুখর ও সজীব করে তুলতে পারবে। অনিতার সঙ্গ বিপাশাকেও খানিকটা তুলে ধরবে।

বিপাশা মারফৎ আর্জিটা কমল পুলকেশের কাছে পেশ করাল। নিজে থেকে পুলকেশের কাছে কোন পোষকতা চাইতে তার ঘৃণা হয়। জীবনটাকে তার ব্যর্থ করে দিয়েছে ভেবে স্বামীর উপর তার একটা বিজাতীয় আক্রোশ।

বিপাশার আর্জি কিন্তু মঞ্জুর হলো না। অনিতাকে ছুটি দিতে পুলকেশ সম্মত হলো না। আপিসের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীকে হিসেব নিকেশের ব্যাপারে নিযুক্ত করতে হয়েছে। পক্ষকাল মধ্যে পাঁচ-ছ বছরের সম্পূর্ণ হিসাব পেশ করতে হবে অমলেশের অ্যাটর্নির কাছে। কাজেই এসময় অনিতাকে ছুটি দিলে অফিসের কাজ সাফার করবে।

কমল শুনে মুখখানা বিকৃত করলে। রুদ্ধ আক্রোশের জ্বালায় তার বুকের নিচেটা শক্ত হয়ে উঠলো। মনে হলো দেহের রক্ত তার বিষিয়ে যাচ্ছে।

গভীর মনস্তাপ, বিরক্তি আর বেদনায় বুক বোঝাই করে কমল বিপাশাকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ যাত্রা করল। নিজেই এখন সে নিজের ভাগ্যবিধাতা। পুলকেশের অবাস্তব প্রভুত্বকে আর সে স্বীকার করবে না। তাকে সে রীতিমত ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। সে তাকে

ঠকিয়েছে। সে তার মনকে বিকৃত করেছে। তার দেহকে বিকল করে দিয়েছে। বিরোধী যান্ত্রিক শক্তির মত তাকে তিলে তিলে ধ্বংস করেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে দিনের পর দিন নির্মমভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। তাই সে এই বীভৎস বাধ্যতার নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। নিজের স্বাধীন সত্তা ফিরে পেয়েছে। জীবনে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। নীতির আর ধর্মের দোহাই দিয়ে আর সে তার দাসত্ব করবে না।

কমল। কমল। কমলকে ছাড়া যে পুলকেশের ঘড়ির কাঁটা নড়ে না। নিশ্বাস নেবার বাতাস পায় না। পায়ের নিচে দাঁড়াবার মাটি পায় না। কমল চলে যেতেই সে পঙ্গু হয়ে গেল। বিয়ের পর একদিনের জন্যও সে কমলকে কাছছাড়া করেনি। ডাক্তারের দুর্বিনীত নিষেধ আর কমলের স্পষ্ট প্রতিরোধেই এই ছাড়াছাড়ি সম্ভব হয়েছে। নিরুপায় হয়ে পুলকেশকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে।

হলে কি হবে? প্রাত্যহিক জীবনের দুরন্ত অভ্যাসটাকে তো কমলের অনুপস্থিতির দোহাই দিয়ে রোধ করা সম্ভব নয়। কমলের শারিরীক অক্ষমতার জন্য তো সে আবার সেই কুমার অতীতে ফিরে যেতে পারে না। পুলকেশ সেই দলের, কৌমার্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নারীসঙ্গ যাদের উগ্র নেশার মত পেয়ে বসে। নারীলিপ্সা যাদের দৈনন্দিন জীবনের আহার নিদ্রার মতই শারিরীক প্রয়োজনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তার মাঝে সূক্ষ্ম কোমল অনুভূতির কোন অস্তিত্ব থাকে না। শুধু অন্ধ অচেতন কদর্য অভ্যাসের দাসত্ব।

কমল পুলকেশের জীবনের প্রথম ও একমাত্র নারী। তার মাঝে পেয়েছে সে নারী রক্তের আস্বাদ। যে-রক্ত তাকে নরখাদক ব্যাঘ্রের মত হিংস্র ও লোলুপ করে তুলেছে।

কমলকে বিদায় দিয়ে তাই সে একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করল। অভাবের একটা অতলস্পর্শী কালো গহ্বর তাকে গ্রাস করতে এলো। শূন্য ঘরে রাত্রে ঘুম আসে না। নিঃসঙ্গ দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘতর হয়ে তাকে

বিভীষিকা দেখায়। একটা তীব্র গোপন উত্তেজনায় তার ইস্পাতের মত শক্ত দেহ থেকে আগুনের হলাকা বেরোয়। কাজের ভিড়ে সারাদিন যদি বা কাটে, নিরলস সন্ধ্যা ও সঙ্গিহীন রাত্রি তার কাটে কেমন করে?

আপিসে টাইপ করা চিঠির তাড়া নিয়ে অনিতা আসে পুলকেশের চেম্বারে সই করাতে। পুলকেশ নিঃশব্দে তাকে বসতে ইঙ্গিত করে হাতের কাজে মন দেয়। অনিতা টেবিলের একপাশে চিঠির ফাইলটা রেখে সামনের চেয়ারে রাশীভূত হয়ে বসে। ঘরের আসবাব পত্র অতি আধুনিক ও মূল্যবান। দরজায় ভারি রঙিন পর্দা। মেঝেতে একই রঙের দামি পুরু কার্পেট। কুশন আঁটা চেয়ার। ঘরের মাঝে কোমল রূপালি আলোর ঝর্ণা। স্বপ্নাবিষ্টের মত অনিতা চেয়ে চেয়ে দেখে। নিভৃত নিশীথশীতল ঘরখানির মাঝে নিবিড় শান্তির আভাস। আরামে চোখ জড়িয়ে আসে। অনিতা একটু তেরছা হয়ে লজ্জালু ভঙ্গিতে স্থির হয়ে বসেছিল। পুলকেশ কাজের মধ্যেই মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকে দেখছিল। দেখছিল তার তীক্ষ্ণ নাক, তার মুখের প্রোফাইল, তার কালো চুলের অজস্রতা। বসবার এই অপরূপ ভঙ্গিটি তার চারিপাশে একটি মোহাবেশ রচনা করেছে। মেয়েলি সৌষ্ঠবের একখানি মধুর ছবি। মেয়েলি মাদকতা ভরা। মেয়েলি কুহক তার সর্বাঙ্গে।

কী একটা ভাবের ঘোরে সে যেন আচ্ছন্ন। তার পাতলা ঠোঁট দুখানি মৃদু কাঁপছে।

পুলকেশ তাকে নতুন চোখে দেখল। কমল-বিরহিত বিস্বাদ জীবনে তার এই সন্নিকট সান্নিধ্য একটা মধুর স্বাদ এনে দিল। তার ভিতরের উপবাসী জীবটা লোলুপ হয়ে উঠলো।

পুলকেশকে সবচেয়ে লুব্ধ করে তুলল তার অনুপম, অনাহত স্বাস্থ্য। তার দেহের স্তবকে স্তবকে ফুলন্ত স্বাস্থ্য। বসন্ত বিদারিত অরণ্যের মত উচ্ছ্বসিত। প্রগলভ। তার কৃশ কটির মালভূমিতে শিলীভূত শ্রোণী-তটের বিস্ফার তার উল্লোল বক্ষচূড়ার লাস্যলীলা উৎপিপাসু পুলকেশের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল।

হঠাৎ চেয়ার ঘুরিয়ে অনিতার স্তব্ধতা খুলিয়ে দিয়ে পুলকেশ বললে, আরেকটু বসো নিতা! আমি এই ফাইলটা শেষ করে নিই।

পুলকেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে অনিতার পানে চেয়ে মৃদু হাসল। শিষ্ট অনুকম্পার হাসি।

অনিতার চোখে একটা অস্বস্তি মেশানো সঙ্কোচ। একটু নড়েচড়ে ভঙ্গির ঢেউ বদলে নিয়ে দ্বিধাজড়িত স্বরে প্রশ্ন করল, একটু পরে আসবো কি?

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে পুলকেশ বললে, কেন? জরুরী কোন কাজ থাকে তো তাই এসো।

পুলকেশের দৃষ্টির কুহকে সে অভিভূত হয়ে গেল। সলজ্জ ভঙ্গিতে আরক্ত মুখ নিচু করে সসম্ভ্রমে সে বললে, অনেক কাজ বাকি। নিজের কাজ ছাড়াও লেজারের কাজ করতে হচ্ছে কিনা—

সিগারেট-টায় জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সহানুভূতির ভেজা গলায় বললে, আমি তোমার জন্য দুঃখিত নিতা। বেচারী বিপাশার আবদার রাখতে পারলুম না। ছুটি তো তোমায় দিলুম না, উপরন্তু তিনজনের কাজ আমি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি। তোমার সম্বন্ধে যে কী করবো—

পুলকেশ সিগারেটে টান দিল। অনিতা কৃতজ্ঞতা ভরা বড়ো বড়ো চোখে তার পানে তাকাল। কুকুরকে আদর করে পিঠ চাপড়ে দিলে সে যেমন ভাবে প্রভুর পানে চায়।

পুলকেশ একতাল ধোঁয় ছেড়ে পোষকতার কণ্ঠে বললে, দেখি—কী করতে পারি।

অনিতার আরক্ত মুখে আর এক পোঁচ রুজ মাখিয়ে দিল। সে মাথা নিচু করলে। পুলকেশ তার সুঠাম মাথাভরা চিকন কালো চুলের পানে চেয়ে গদগদ স্বরে বললে, আমার মনে থাকবে অনিতা। তোমার পরিশ্রম বৃথা যাবে না। ওদের সঙ্গে তোমায় পাঠাতে পারলে আমি

অত্যন্ত সুখি হতুম। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারছো তো, উপায় ছিল না।

অনিতা সগর্বে অথচ সবিনয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল।

পুলকেশ সহজ বন্ধুত্বের কণ্ঠেই বললে, এ বিশ্রী ঝামেলা না মিটলে আর আমি মাথা তুলতে পারছি না।

অনিতার ভীরু চাপা মন দুলে উঠল। পুলকেশের কণ্ঠটা কেমন দুর্বল শোনালো। আরক্ত মুখে, বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ চোখে অনিতা তারপানে চেয়ে আত্মীয়তার সুরে বললে, পরিশ্রম কি আপনারই কম হচ্ছে?

—আমার কথা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে কে? আর করবেই বা কেন? পরিশ্রমের চেয়ে স্বার্থটা যে বড়ো।

মাথাটি চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে পুলকেশ হাসলো। আপন মনে বিড়বিড় করে বললে, কিন্তু তোমার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য কি আমি দিতে পারছি? পুলকেশের কালো মোটা ভুরু দুটি নেচে উঠল। সে সোজাসুজি চোখ তুলে তার পানে চাইল। একটা শিখা তার চোখ থেকে ছিটকে এসে অনিতার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। সন্ধানী আলোর মত চোখের তীব্র দৃষ্টি তার সর্বাঙ্গ লেহন করতে লাগল।

অনিতা ভিতরে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশান্তিতে মনটা ভরে গেল। সে আড়চোখে পুলকেশের মুখের পানে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

পুলকেশের মুখে যেন একটা কাতরতার কুয়াশা। একটা করুণতার ক্লান্তি। সে মাথা নিচু করে কাচের একটা ভারি পেপার-ওয়েট নিয়ে নিঃশব্দে নাড়াচাড়া করছে আর মনে মনে একটা মতলব আঁটছে।

অনিতা তার আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল। আচমকা সে মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা তুলে আদেশ করল, তুমি এখন যাও নিতা। আমি তোমায় ডেকে পাঠাবো।

অনিতা চমকে গেল তার স্বরের প্রাখর্যে। তার ক্ষিপ্রতায়। তার দ্রুততার দীপ্তিতে। সে কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে ঢাকা দিল।

হঠাৎ যেন আলো নিবিয়ে নিজেকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল। হ্যাঁ, বলতে কী সে চেয়েছিল। বলতে পারলে না। মুখ ফুটে না বললেও অনিতা পুলকেশের চোখে সেই ইঙ্গিতের আভাস পেয়েছে, পুরুষের চোখের যে ইঙ্গিতে আদিম নারী বিহ্বল হয়েছে। বিমূঢ় হয়েছে। অনিতা হৃদস্পন্দনের মধ্যে শুনতে পায় অনাদিকালের সেই গোপন আহ্বান। তার চোখ দুটি স্বপ্ন-ফেনিল হয়ে ওঠে। রক্তে জাগে একটা প্রচ্ছন্ন অনুভূতির ঢেউ। কী বলতে চায় পুলকেশ? সে স্পন্দিত হৃদয়ে তার ডাকের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ডাক এলো।

নিজেকে গুছিয়ে ও সহজ করে নিয়ে অনিতা কম্পিত বুকে পুলকেশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

চিঠি সই করতে করতে মুখ না তুলেই পুলকেশ দুম করে প্রশ্ন করে বসল, তোমার লান্চ হয়েছে?

অনিতার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। পুলকেশ কি তাকে বিদ্রূপ করছে নাকি? অনিতার লান্চ মানে তো একখানা শুকনো টোষ্ট কিংবা একখানা সিঙারা আর এক পেয়ালা চা। প্রশ্নটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকলো। সে উত্তর দেবার ভাষা পেল না গলায়।

পুলকেশ মাথা গুঁজে চিঠি সই করতে লাগল।

টেবিলের দিকে ঝুঁকে অনিতা উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা বিলোল ফুলের মত। পুলকেশ কলমটা বন্ধ করে সোজা তার লজ্জারাঙা মুখের পানে তাকাল। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, কী আপত্তি আছে?

—কিসের?

সংশয়ে ও শঙ্কায় তার কালো চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলো জড়িয়ে এলো।

পুলকেশের যেন চেতনা ফিরে এলো। কুটিল হয়ে উঠল তার মুখ চোখ গভীর আত্মীয়তায়। ছেলেমানুষের মত অঙ্গভঙ্গি করে বললে,

ভারী খিদে পেয়েছে। বাড়ি থেকে তো খাবার আসছে না। চলো, বাইরে কিছু খেয়ে আসি।

সঙ্গে সঙ্গে পুলকেশ উঠে দাঁড়াল। অনিতাকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সে আদেশের ভঙ্গিতে বললে, এসো।

মৌন ছায়ার মত অনিতা তার অনুসরণ করল।

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যারা জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে বেরিয়েছে তাদের এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না। তা ছাড়া মনিবের এ রকম ছোট খাটো খেয়াল খুশির বিরুদ্ধাচারণ করাও তো যায় না। নিজের শক্তি সম্বন্ধে অনিতার মনে একটা অহঙ্কারও ছিল। সে মোমের পুতুল নয় যে পুরুষের গায়ের তাপ লাগলেই গলে যাবে। সে শক্ত মেয়ে। শক্ত হাতেই সে জীবনের রাশ ধরে রেখেছে। হাত আলগা হবার ভয় নেই।

একটা সম্ভ্রান্ত হোটেলের পরিচ্ছন্ন নিভৃতে একসঙ্গে খেতে বসে অনিতার মনে ঘোর লাগল।

নারীপুরুষের মিলিত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার নেই। এ ধরণের হোটেলের ভিতরে আসবার সৌভাগ্য তার কখন ও হয়নি। এর বিচিত্র নিবেশ, এর চাকচিক্য, এর অন্তপ্রবাহের উচ্চকিত কলধ্বনি, এর সৌরভের মাদকতা অনিতার মনে নেশা ধরিয়ে দিল। সম্ভোগের এই বিপুল সমারোহ, জীবনের এই অপরিমেয় উপকরণ উপচার তার কাছে অনাবিষ্কৃত অপরিচিত পৃথিবী। এই নতুন পরিবেশে, নতুন নির্জনতায় নিজেকে তার নতুন মানুষ মনে হলো। একটা অভিনব অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে দোল দিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দাম কৌতূহল অনিতাকে পেয়ে বসেছে। কী চায় পুলকেশ? সে তাকে জানতে চায়। দেখতে চায় কী আছে তার এই নীরব অভ্যর্থনার অন্তরালে। সে তাকে চিনতে চায়। চিনতে চায় তার

ভিতরের পুরুষকে। কামনাময় বলিষ্ঠ পুরুষকে। পুরুষের কামনা বাসনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

পুলকেশ তার মনিব।

এতোদিন সসম্মানে নিষ্ঠার সঙ্গে তার আদেশ পালন করেছে। মনিবের আদেশ পালন আলো বাতাসের মত স্বাভাবিক ব্যাপার। নির্বিচারে এতোদিন সে আদেশ মান্য করেছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মনিবের সঙ্গে যে নতুনতরো সম্বন্ধের সূচনা হতে বসেছে তার চেহারাটা কল্পনা করে সে চমকে গেছে।

এ যেন একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত। পুলকেশ বড় একা। একান্ত নিঃসঙ্গ। সাংসারিক জীবন তার সুখের নয়। দাম্পত্য জীবন তার অভিশপ্ত। সঙ্গ দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে তার দুঃসহ নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার আকুল আমন্ত্রণ জানালো অনিতাকে।

অনিতা এতটা ভাবেনি। সে থমকে দাঁড়িয়েছে। সে তমিস্রা রাত্রির গহনে দিশাহারা হয়ে গেছে। এ তো মনিবের আদেশ নয়। প্রভুত্বের অধিকার নয়। এ আবেদন। এ প্রার্থনা। রিক্ত মনের হাহাকার। ভাবতে মনে আমোদ লাগে। প্রভু তার দোরে প্রার্থী। ভিতরের নারী কিন্তু মায়ায় কেঁপে ওঠে।

কোন জবাব দিতে পারে না অনিতা। গলায় ভাষা পায় না। তার কালো বড় বড় চোখদুটি করুণায় জ্বল জ্বল করে উঠল।

পুলকেশ তার স্তব্ধতার অন্তরালে নীরব সম্মতির আভাস পেল। তার সাহস বেড়ে গেল। সে অনিতার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে ধূসর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কী ভাবছো তুমি নিতা ?

অবনমিত ভঙ্গিতে অধোবদনে অস্ফুটস্বরে অনিতা বললে, বউরাণি ?

পুলকেশ তার কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে উৎসাহের কণ্ঠে বললে, তার কথা কি আমি ভাবিনি নিতা ? অনেক ভেবেছি। কিন্তু আমি কী করতে পারি ? নিয়তির বিধানকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তো আমাদের মানুষের নেই। নিজের জীবনকে ক্ষয় করে তাকে তো আমি

সুস্থ করে তুলতে পারবো না ? অথচ আমি সুস্থ সবল মানুষ। নির্জীব পঙ্গুর ঠেকো হয়ে তো আমি সারাজীবন কাটাতে পারি না ?

কথাগুলো অনিতার কানে গেল কিনা কে জানে। অপ্রশস্ত ঘরের মধুর নিস্তব্ধতা যেন তাকে আঁকড়ে ধরেছে। নিঃসম্পর্ক পুরুষের নিবিড় সান্নিধ্যের উত্তাপে, তার বলিষ্ঠ মোহময় পুরুষ স্পর্শে অনিতার শরীরময় জেগেছে নতুনতরো লাস্য। যৌবনের মেঘস্তর ভেদ করে শরীরে ফুটছে রহস্যময় জ্যোৎস্না। মনের মেঘলা রাত কেটে ঝাপসা দিগন্তে ফুটছে নতুন ভোরের আলো। সে আবেগে থর-থর করে কাঁপছে।

পরাক্রান্ত, ধনবান, রূপবান পুরুষ তার দোরে এসে দাঁড়িয়েছে পূজার অর্ঘ নিয়ে। নিজেকে তার নুরজাহান মনে হলো। রাজাধিরাজ সেলিম এসেছে তার কৃপা প্রার্থী হয়ে। এ সৌভাগ্য সূচনা যে তার দুঃস্বপ্নেরো অতীত ছিল। বিগত দিনের চোখের-জলে-ভেজা দুঃখস্মৃতির ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিজের শক্তির উপর ভর করেই সংসারের দুর্গম পথে সে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছে। কোন ঠেস ছিল না। আপনজন বলতে কেউ ছিল না। অনেক দুঃখের প্রান্তর পেরিয়ে, অনেক দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তবে সে কমলের দেখা পেয়েছে। কমলই তাকে হাত ধরে পুলকেশের কাছে পৌছে দিয়েছে। পুলকেশ তার সৌভাগ্যের দোর অবারিত করে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

সে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে কেমন করে ? তাকে প্রত্যাখ্যান করা মানে সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দেওয়া। নিজের সেই ক্লান্তিকর, শ্বাসরোধী অন্ধকার অতীতে আবার নতুন করে ফিরে যাওয়া। ভাবতে তার বুক কাঁপে। উঃ! কী দুঃসহ দুর্বহ জীবন তাকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে! আর সে পারবে না ফিরে যেতে সেই ভয়াবহ একাকীত্বের মৃতপ্রায় করুণ অন্ধকারে। তার সামনে অবারিত অজস্র আকাশ। উচ্ছ্বসিত দিগন্তরেখা। নিশ্চিত নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আরাম রমনীয় গৃহকোণ, সবল, শক্তিমান পুরুষের ঠেস। পুরুষের আশ্রয় না হলে মেয়ে বাঁচে না। পুরুষের স্পর্শ না পেলে মেয়ে দেহে ফুল ফোটে

না। একা আর সে কতদিন থাকবে? এই অসহ্য নির্জনতার গভীর অন্ধকারে যে তার যৌবন নিঃশেষিত হয়ে এলো। যৌবন সুষমার স্বাদ পরিবেশন করবে না কোন পুরুষের অধরে? নিজেকে উৎসর্গ করে দেবে না কোন রূপবান পুরুষের বলিষ্ঠ বুকে? নিজের ব্যথিত যৌবনকে স্বাদ দেবে না প্রমত্ত পুরুষের সতেজ আসঙ্গের? তার শিলীভূত পাষাণ কৌমার্য কী চিরদিন দুর্ভেদ্য দুর্গম হয়েই থাকবে? পড়বে না সেখানে কোন পথিকের পদচিহ্ন? একা সে চিরদিন। কিন্তু সে যে কত একা আর কত নিঃসঙ্গ তার পরিমাপ করতে গিয়ে আজ সে হাঁপিয়ে উঠল।

পুলকেশের কণ্ঠ অনর্গল হয়ে উঠেছে তার প্রশস্তি গানে। তার রূপের প্রশস্তি। তার বিকশিত যৌবনের প্রশস্তি। পুরুষের যে প্রশস্তি নারীমনের স্তব্ধতা ভেঙ্গে আবর্তে আবিল করে তোলে।

পুলকেশের বুঝতে বাকি থাকে না যে অনিতার ধ্যান ভেঙ্গেছে। ঘুম ভেঙ্গেছে। এখন তার মুখের শেষ কথাটি শোনবার প্রতীক্ষা তাকে অনু পরমানুতে গ্রাস করেছে। সে স্তব্ধ হয়ে অনিমেষে তার লজ্জারাঙা মুখের পানে চেয়ে দেখছে। যত দেখছে তার কামনার শিখা লেলিহান হয়ে উঠছে। অনিতাকে তার আশ্চর্য সুন্দরী মনে হচ্ছে।

—তুমি কিন্তু কিছুই খাচ্ছো না নিতা। তোমার খাওয়াটা আমি মাটি করে দিতে চাই না। আগে খেয়ে নাও। তারপর আমার কথা ভেবো এতো ভাববারই বা আছে কী? শুধু ভাববে আমাকে বিশ্বাস করতে পারো কিনা। সেই সব চেয়ে বড় কথা।

অনিতা অর্ধ-নিমিলিত চোখে কুণ্ঠিতা নববধূর মত তারপানে মুহূর্ত চোখ তুলে মৃদু হাসল।

পুলকেশ বললে, ক্যারি অন। খেয়ে নাও। আর কী খাবে বলো। ভাবনার অন্ধকারে তলিয়ে যেও না। অমন সুন্দর মুখখানাকে কালো করো না।

অনিতা আর একটা সলজ্জ হাসি ছুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে বিদ্যুৎ হানলো।

পুলকেশ বললে, হ্যাঁ। দয়া করে হাসো। ঐ হাসির মাঝেই তোমার অধিকারের দাবি নিয়ে এসো। আমি তো আগেই তোমার কাছে সব সমর্পন করেছি। তুমি আমায় নাও। ওগো, করুণাময়ি, অভাগার ব্যর্থ জীবনকে তুমি সার্থক করো। আমি অত্যন্ত অসুখি।

পুলকেশের চোখে কাতরতার কুয়াশা। কণ্ঠ বাষ্পার্দ্র।

অনিতার ভারি মায়া হয়।

॥ পাঁচ ॥

পুলকেশ লোকটা কিন্তু ভারি অধৈর্য। অনিতা বেচারিকে মন ঠিক করতে একটা দিনেরও সময় দিতে চায়না। আজই রাত্রে তার কাছ থেকে সে শুনতে চায়। শুনতে আর কি ছাই চাইবে। আজই রাত্রে সে তাকে পেতে চায়। সে তাকে নিজের বাগান বাড়ির নিভৃতিতে আপন করে নিতে চায়। তার সবুর সইছে না। এ ভারি বিশ্রী লাগে অনিতার। পণ্য নারীর মত সে যেন তাকে মূল্য দিয়ে কিনতে চায়। কিন্তু নিজের সম্মতির চেহারাটা কল্পনা করে সে অন্তরে শিউরে ওঠে। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মেয়ের মত ভ্রষ্টা হবার চরম দুর্গতি থেকে নিজকে সে বাঁচাতে চায় বই কি!

কিন্তু নিজেকে সে বাঁচাবে কেমন করে? তীব্র চোখ-ঝলসানো আলোর কাছ থেকে পতঙ্গর পালাবার শক্তি কোথা? পুলকেশকে সে বাধা দেবে কেমন করে? আর সত্যই ত মন তার মুখ ফিরিয়ে নিতে চায় না। পুলকোশর দুর্বলতা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও যে সংযমের বাঁধ ভেঙেছে। তার পিপাসিত যৌবন অন্ধ আবেগে মেতে উঠেছে। সারাদিনের ক্লান্তির পর তার আতুর দেহমন পুরুষের ভাল-বাসার উত্তপ্ত স্পর্শ পাবার সুপ্ত বাসনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এ-কথা সে অস্বীকাব করবে কেমন করে?

পুলকেশ তাকে জাগিয়ে তুলেছে। তার জীবনের অমিত অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে আশ্রয়, উত্তাপে ও সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সে স্বপ্ন চোখ থেকে মুছে ফেলতে চায় না অনিতা। এ অযাচিত সৌভাগ্যকে সে বিমুখ করতে পারবেনা। কে বলতে পারে অদৃষ্ট তার ভাবীলোকে তার জন্য কী গুপ্তধন সঞ্চিত করে রেখেছে। কে জানতো মেহেরউন্নিসা নুরজাহান হবে।

ভারতেশ্বরী হবে। কে বলতে পারে অমিতা বউরাণী হবে না। অঘটন ও ঘটে। অলৌকিক ও অসম্ভব নয়। ঘটুক না ঘটুক কিন্তু প্রত্যাশাকে সে পদাঘাত করবে কেন?

কমলকে তার মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার রোগ-ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানি। কমল তাকে ভালবাসে। তাকে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছিল। সেও কমলকে ভালবাসে। কিন্তু সে করবে কী! অদৃষ্ট তার বিরূপ। এ নিয়তির চক্রান্ত। নইলে এ অদৃশ্য যোগাযোগ ঘটত না। সে নিজে থেকে অনিতাকে পুলকেশের কাছে পৌঁছে দিত না। এ অমোঘ নিয়তি। কমলের তারা অস্ত যাচ্ছে। অনিতার তারা উঠছে। দুটি অদৃষ্ট-তারকার লড়াই চলেছে। এক জন আরেক জনকে মুছে ফেলছে। মেহেরউন্নিসা'র শুভাদৃষ্ট শের আফগানের দুরদৃষ্ট এনেছিল। তার পতন ঘটিয়েছিল।....অমিতা চমকে ওঠে। তার বুক কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় সে বউরাণীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে চলেছে পুলকেশের সঙ্গে। সে বাক্স পেঁটরা খুলে ভালো একখানা শাড়ি খুঁজছিল পুলকেশের সঙ্গে বাগানে যাবার জন্য। মনে হলো সে বউরাণীকে হত্যা করবার মারাত্মক কোন অস্ত্রের সন্ধান করছে। সে ঝপ করে বাক্সর ডালাটা বন্ধ করে হাত গুটিয়ে নিল।

হঠাৎ তার মনে হলো সে যেন একটা বৃহত্তর প্রাপ্তির লোভে রুদ্র আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

পুণ্য করার চেয়ে পাপ করা ঢের শক্ত। আবার পাপ করার চাইতে পাপের বিশদ আয়োজন করা আরো শক্ত। কাজটা করে ফেলতে না পারলে মন কিছুতেই সহজ হয়ে ওঠে না। একবার অন্ধ হয়ে ধরা দিতে পারলে ধরা দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে।

আয়নার সামনে বসে এলোগায়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে অনিতা এমনি সব নতুন তরো ভাবনার দাপটে দুলছিল। আজকের পূর্বে এ-সব রোমাঞ্চর চেহারা দেখেনি। কল্পনাও করেনি। নতুনত্বে ভরা রোমাঞ্চ উপন্যাসের মত। নিজেকে উপন্যাসের নায়িকা মনে হয়। উদ্ভট দুঃসাহসী

প্রেমিকা মনে হয়। অভিসারিকা মনে হয়। আজ জীবনে প্রথম রূপকে তার হানা দেবার অস্ত্র মনে হয়। প্রসাধনের শানপালিশ দিয়ে তাকে ধারালো ও চকচকে করে তুলতে বসেছে। মনে মনে হাসি পায় অনিতার। ভয়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় তার শরীরকে মুহুর্মুহু কাঁপিয়ে তোলে। পুরুষ রক্তের স্বাদ পাবার জন্য শরীর যেন তার হিংস্র ও লোলুপ হয়ে উঠেছে। শক্তিমান পুরুষের সমকক্ষ হবার শক্তি সংহত করছে।

তার যা কিছু মহার্ঘ, যা কিছু মূল্যবান সব গায়ে দিয়ে নিজেকে সে মূল্যবান করে তুলতে চাইল।

কী বা তার আছে?

আজ নেই। কাল হবে। আজকের অন্ধকার গ্রাম কাল আলোকাকীর্ণ নিশীথ নগরীতে পরিণত হবে। আজকের মেহেরুন্নিসা কাল নুরজাহান হবে।

একটা স্বপ্নের ঘোরে পুলকেশের দমদমের বাগানে গিয়ে উঠলো অনিতা। ইন্দ্রপুরী। ভোগের রঙমহল। রূপকথার রূপমহল। অনিতার চোখ ঝলসে যায়।

তার জন্য এতো আয়োজন? এতো অভ্যর্থনা? এতো আড়ম্বর!

পুলকেশ যেন কী?....একী তাদের ফুলশয্যা হচ্ছে নাকি? যেন বাসর সাজিয়েছে।

অনিতা নিছক অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে পুলকেশের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল। পুলকেশ তাকে গ্রাস করল দুর্ভিক্ষ পীড়িত ক্ষুধিতের মত। দস্যুর মত লুণ্ঠন করল তার বাইশ বছরের অনাঘ্রাত কুমারী দেহের শুচিতা শুভ্রতা। অনিতা তার বলিষ্ঠ আশ্লেষের অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাইরের পৃথিবী তার কাছে বন্ধ হয়ে রইলো। তার চেতনা থেকে পরিদৃশ্যমান জগৎ লুপ্ত হয়ে গেল। জীবনের ক্ষেত্র থেকে সে বহিষ্কৃত। নিজের ভিতর নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছে না। নিজেকে সে তার বক্ষলগ্ন পুরুষের মাঝে বিলীন

করে দিয়েছে। এক হয়ে গেছে সে তার সঙ্গে। এই একত্বই তার সমগ্র চেতনার স্থান জুড়ে আছে। তার অবচেতন মনের ফাঁকে ফাঁকে যেন ঘুম জড়িয়ে আছে। তার সমর্পিত দেহের অন্তরীক্ষ জুড়ে যেন একটা নতুনতর নৃত্যোৎসব চলেছে। তালে তালে পা ফেলে নৃত্য করতে করতে তার ভিতরের কুমারী মেয়েটা বিদায় নিয়ে অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর অদৃশ্য অন্ধকারের অতল থেকে নতুন ছন্দে নতুনতর ভঙ্গিতে নৃত্য করতে করতে আবির্ভূত হচ্ছে তার ভিতরের নতুন নারী। অনাদি অনন্ত কালের মেয়ে পুরুষের মিলনের ইতিহাস তার নৃত্যের ভঙ্গিতে। উচ্চারিত তার মুখর নূপুরের তালে।

অনিতার জীবনে যা ঘটলো, পুরুষের যে-স্পর্শ আজ প্রথম তার দেহকে অভিনন্দিত করলো এই কি মেয়ে পুরুষের মিলনের শাশ্বত ছবি?....অনিতা চোখ বুঁজে ভাবে। কৌমার্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে যে নতুন আলো জ্বলেছে তারই আলোয় ওর উন্মীলিত চোখের দৃষ্টিশক্তি হয়েছে প্রখর। সেই আলোয় চোখ মেলে ও পুলকেশের পানে মুহূর্ত তাকাল। পুলকেশও চেয়ে আছে তার পানে। পুলকেশের মুখে গভীর তৃপ্তির আভাস। চোখে ঘুমের নেশা। সমস্ত শরীরে একটা মধুর মন্থরতা। মুখে নেই সেই পীড়িত পিপাসা। চোখে নেই সেই রুদ্রদাহ।

পুলকেশ একটা সুখাবেশে অনিতাকে কাছে টেনে নিয়ে সকৌতুক স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, ভয় নেই। ঠকলে না। তোমার বিশ্বাসের অমর্যাদা হবে না। জীবনভোর আজকের এই রাতটির কথা মনে থাকবে।

অনিতা পাশ ফিরল। বিছানা কথা কথা বললে: এরি নাম কি ভালোবাসা? না, এ নিয়তি?

—নিয়তির অমোঘ বিধান না মেনে তো উপায় নেই। বিচলিত হয়ো না। আজ যার চেহারা দেখে ভয় পাচ্ছো, কাল তা জীবনে পূর্ণতা আনবে।

শিমুলতলা।

তিনমাস হলো কমল বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে । এ-ও তাদের নিজের বাড়ি।

ছোট একটা পাহাড়ের চুড়োয় হুর্গের মত বাড়ি। বাড়ির নাম রায়গড়।

পথ হতে সিঁড়ির মত একটা চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়ের মাথায় উঠে বাড়িতে পৌঁছতে হয়। বাড়ির চারিপাশে হুর্গের মত পাঁচিল ঘেরা। দূর থেকে পাহাড়ের চুড়োয় সাদা বাড়িখানা স্ফটিকের মত চক-চক করে।

এ অঞ্চলে জোরালো শীত পড়েছে। দিনের বেলা সূর্যের তাপে, পাথর তেতে উঠলেও হিমেল হাওয়া সে তাপ শুষে নেয়। রাতে প্রচণ্ড শীত।

বাড়ির সামনে পথের দুধারে ফুলবাগান। গোলাপ, ক্রিশানথিমাম, গাঁদা, ডালিয়া। শীতের মরশুমি ফুলে বাগান থৈ থৈ করছে। সামনে মাথা-ঢাকা একটা চাতাল। সেখান থেকে নিচের উপত্যকায় থরে থরে সাজানো রঙ বেরঙের বাড়িগুলো ছবির মত দেখায়। দূরে রেললাইন। সিগনলের পাখা। নদির বুকে একটা সাঁকো। দিগন্ত-বিস্তারী শীতের পোড়া মাঠ। মাঠের ধারে বাড়িঘর। গাছপালা। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অতিকায় শিলাখণ্ড। দিগন্তের কোলে ধোঁয়াটে পাহাড়। যেন মায়ারাজ্য।

ঘুম থেকে উঠে কমল আর বিপাশা এই চাতালে বসে পাহাড়ের পেছন থেকে সূর্যোদয় দেখে। গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে সকালের কচি রোদ গায়ে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে তাদের গায়ে এসে পড়ে। এইখানে সকালে বিকেলে তাদের চায়ের আসর জমে।

বিয়ের পর একাধিকবার কমল এ বাড়িতে এসেছে পুলকেশের সঙ্গে। পূর্ণ স্বাস্থ্য ও প্রসন্ন মন নিয়ে। এবারে আসতে হয়েছে তাকে ভাঙন-ধরা দেহমন নিয়ে।

আয়োজনের ত্রুটি নেই। লোকজনের অভাব নেই। সরকার গোমস্তা, পাচক, দাসদাসি সবই এসেছে সঙ্গে। তাছাড়া এখানকার মালি চাকর তো আছেই।

কলকাতা থেকে প্রতি হপ্তায় আসে ঝুড়ি ভরতি হাটবাজার। ফলমূল। রায়গড়ে বউরাণি এসেছে। স্টেশন মাষ্টার থেকে শিমুল তলার সকলেই সে খবর জানে। কেউ জানে না বউরাণির মনের খবর। সে বউরাণি আর এ বউরাণির মাঝে যে আকাশপাতাল প্রভেদ সে খবর জানে শুধু কমলের অন্তর্যামী। আর কিছুটা জানে বিপাশা। দেহের সে শ্রী নেই। মনে নেই স্বপ্নের রঙ। মরচেধরা ভোতা ছুরির মত সে অকেজো। প্রথম প্রথম এখানে এসে মনে একটা স্বস্তি পেয়েছিল। শরীরও কিছুটা মেরামত হয়েছিল। পুলকেশের সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পেয়ে সে হাঁপ ছেড়েছিল। পুলকেশের কামনার আবিল আবর্তে সে ভরাডুবি হতে বসেছিল। সেই বানচাল নৌকোকে চড়ায় এনে তুলতে পেরে খানিকটা আরাম বোধ করেছিল।

পুলকেশের লোলুপতাকে সে চিরদিন ঘৃণা করে এসেছে। তবু সে নিজের চেতনার কণ্ঠরোধ করে তার পশুশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তার প্রাণশক্তি সে শুষে নিয়েছে সেই প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানে। তার সৌন্দর্য চেতনাকে অন্ধ করে দিয়েছে। কর্তব্যবোধে পুলকেশের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে সে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছে। কত বিশ্রী আর কী জঘন্য যে সেই প্রেমহীন দেহ সমর্পণ, তবু সে অকপটে পত্নীত্বের বশ্যতা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। পুলকেশ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া, অন্য জগতের মানুষ। তার মাঝে নিজের কোন মিল খুজে পেল না। কোন সামঞ্জস্য কোন সান্ত্বনা পেল না। তাই সেই কুৎসিৎ বাঁধন ছিঁড়ে নিজেকে সে দূরে সরিয়ে নিল।

দুপুর পেরিয়ে বেলা গড়িয়ে গেছে।

শীতের সঙ্ক্ষিপ্ত অপরাহ্ন। সারা দুপুর কমল আর বিপাশা বাইরের রৌদ্রে বসে কাটিয়ে দিল। উল বুনে আর গল্প করে।

দুপুরে কমলকে ঘুমোতে দেবে না বলেই বিপাশা তাকে চোখে চোখে রাখে। কাছ ছাড়া হয় না। এখানে এসে পর্যন্ত বিপাশা কমলের জীবনের দায় দায়িত্ব নিজের হা'তে তুলে নিয়েছিল। ওষুধ খাওয়া থেকে স্নান-আহার, বেড়ানো ঘুমানো সব ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত করে দিয়েছিল। তার ব্যতিক্রম হবার জো ছিল না।

কমল হেসে বলে, আমার মাও এমন শাসনে রাখেনি। অথচ ছেলে বেলায় আমি কী দুরন্তই ছিলুম।

বিপাশা গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে বলে, দুরন্ত ছেলেমেয়েদের আমি পছন্দ করি। সইতে পারি না তোমার মত মনমরা গোমরা মুখো আর শান্তদের। বিশ্রী লাগে। যেন কলের পুতুল। দম দিলে তবে নড়বে চড়বে।

কমল তার মুখপানে চেয়ে হাসতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বিপাশা চকিতে তার পানে কুটিল চোখে চেয়ে বলে. ওই হচ্ছে তোমার রোগের ঘর। থেকে থেকে ইঞ্জিনের মতো ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বেস ফেলা।

—ওরে তা না হলে ইঞ্জিনের বুক ফেটে যেতো। মানুষ দম ফেটে মরতো।

বিপাশা হেসে ফেলে।

কমল স্তব্ধ হয়ে আকাশের পানে চায়। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে রঙের হোলি খেলা হচ্ছে। সোনালি আলোর বন্যায় আকাশ ঝলমল করছে। সে আলোর ঢেউ লেগেছে ঝাউবনের মাথায়। বনভূমি কাঁপছে ঢেউয়ের তোড়ে। দূর পাহাড়ের চূড়াগুলো সূর্যাস্তের আভায় সমুজ্জ্বল।

কমল বললে, চেয়ে দেখ বিপাশা, সূর্যি ডুবছে। সোনার রঙে সব ডুবে গেছে। আকাশের পানে চেয়ে দেখ। আবেগে থর থর করে কাঁপছে। এখুনি রঙ বদলাবে। কী সুন্দর! পৃথিবীর সব সৌন্দর্য যেন ঐ আকাশের বুকে জড়ো হয়েছে।

বিপাশা তার মুখের পানে তাকাল। মুখে তার এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। সুন্দর দেখাচ্ছে তার মুখখানি। বিশাল একটা সূর্যমুখি ফুলের মত।

একটু থেমে কমল আবার বললে, ও রূপ সত্যিকার। চিরস্থায়ী। ভালোবাসার মতই অক্ষয় ও অমর।

কমল নিস্পন্দের মত একাগ্রদৃষ্টিতে আকাশের বর্ণসমারোহ দেখছে। সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটায় তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে। ভাবাবেগে ঠোঁটদুখানি ফুলের পাপড়ির মত কাঁপছে।

কমল আপন মনে বললে, ঐ দেখ গোলাপী আভা কেমন আস্তে আস্তে একটু একটু করে টকটকে লাল হয়ে উঠছে।

ভাবের উচ্ছ্বাসে বাহ্যজ্ঞান বিরহিতের মত হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো, অমু! অমু! কোথায় তুমি? কোথায় তোমার রঙ তুলি?

—অমু? অমু কে?

চমকে উঠে বিপাশা জিজ্ঞেস করল।

কমল অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে ধপ করে বেতের একটা চেয়ারের গর্ভে ভেঙ্গে পড়ল। অতর্কিত আক্রমনে চেয়ারটা মড়-মড় শব্দে আর্তনাদ করে উঠল।

অপ্রতিভ হয়ে কমল শুষ্ক স্বরে উত্তর দিল, অমু—আমাদের অমু – অমলেশ। আমাকে একখানা সূর্যাস্তের ছবি এঁকে দিয়েছিল। দেখিস নি? আমার ঘরে টাঙানো আছে?

বিপাশা তার পাশে বসে, হাতদুখানি তার নিজের হাতে চেপে ধরে বললে, তুমি যেন কী? মাঝে মাঝে কী সব হেঁয়ালি যে বলো, আমি বুঝতে পারি না। ভয়ে মরি।

কমল নিঃশব্দে চোখবুঁজে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ একটা মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে চোখ খুলে তাকাল বিপাশার পানে। ঝাপসা গলায় বললে, যাক। চলে গেছে।

—কে চলে গেছে? বিস্মিত আতঙ্কে প্রশ্ন করলে বিপাশা।

কমল অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে হাসল। স্খলিত সে হাসি। তার মাঝে লজ্জার মেশাল আছে। মাথা নিচু করে গোপন কথা বলার মত ফিস ফিস করে বললে, ঐ অমু। ও যেন আমার মাঝে মাঝে পেয়ে বসে।

বিপাশা তার হিমশীতল হাত দুখানি নিজের তপ্ত মুঠোর ভিতর চেপে ধরে পাথর হয়ে গেল।

দুজনেই চুপচাপ।

উতল বাতাস হাহাকার করে উঠল তাদের কানের কাছে। আকাশের বিচিত্র আলোর আভা ঝাপসা হয়ে এলো। জগৎ জুড়ে আঁধার নেমে এলো। এক ফালি চাঁদ কোন ফাঁকে আকাশে ভেসে উঠে গাঢ় অন্ধকারকে ফিকে করে তুলল। তারা কিছুই জানতে পারলে না।

—বউরানি!

দুজনেই চমকে চেয়ে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে বৈকুণ্ঠ সরকার।

—কী বৈকুণ্ঠ? কমল প্রশ্ন করল।

বৈকুণ্ঠ বললে, স্টেশন মাষ্টারের কাছে টেলিগ্রাম এসেছে। দিল্লী এক্সপ্রেসে ছোট বাবু আসছেন।

—কে অমলেশ?

—আজ্ঞে হাঁ। দিল্লী থেকেই বোধ হয় আসছেন। মাঝপথে কোন স্টেশন থেকে তার করেছেন।

অমলেশ আসছে। হঠাৎ?

বৈকুণ্ঠ বললে, ট্রেন আসে রাত ন'টায়। আমরা স্টেশনে থাকবো।

—আচ্ছা।

মাথা নেড়ে সায় দিল কমল।

বিপাশা বললে, আমিও স্টেশনে যাবো।

—এই দুরন্ত শীতে?

—তা হোক।

বৈকুণ্ঠ চলে গেলে বিপাশা হাসতে হাসতে বললে, ভদ্রলোক অনেকদিন বাঁচবে।

ভিতরে যেতে যেতে কমল বললে, আমি জানতুম। সে আসবে।

এখানে এসে পর্যন্ত কমলের জীবনযাত্রার প্রবাহ ছিল নিস্তরঙ্গ। ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্যে বিপাশাকে সম্বল করে নিরুদ্বেগে দিন কাটছিল। মাঝে একদিন পুলকেশ এসে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। কমল অশান্ত হয়ে তাকে স্পষ্ট বলেছিল, আমাকে যদি বাঁচতে দিতে চাও, দয়া করে কিছুদিন আমায় একা থাকতে দাও। তোমার গায়ের হাওয়া আমাকে বিষিয়ে দেয়।

অপমানের আঘাতে আহত কুকুরের মত সে নিঃশব্দে ফিরে গেল। তারপর থেকে সে নিরুপদ্রবে নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল। আজ সন্ধ্যা থেকে, অমলেশের আগমন সংবাদ তার মনকে আনন্দে উতরোল করে তুলল। তার মনের পায়ে নূপুর পরিয়ে দিল। সময়ের আঘাতে শরীরের স্তব্ধতায় জীবনের যে-সুর জুড়িয়ে গিয়েছিল সেই সুর আবার অকস্মাৎ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল মনের নিভৃত কন্দরে। সে বর্ষাসিঞ্চিত বনানীর মত চঞ্চল ও প্রগলভ হয়ে উঠল। সূর্যোদয়ের আভাসে গিরি গুম্ফার বরফ গলতে সুরু হল। দেহে রক্তের জোয়ার এলো। সর্বশরীর তেতে উঠল।

অমু। অমু। অমলেশ!

অমলেশ তার মনের মাঝে উত্তাল হয়ে উঠল। সে তাকে ভোলেনি। তা হলে এখানে সে আসতো না। সে-ও তাকে ভোলেনি। ভুলতে পারেনি। সে তাকে ভালবেসেছিল কায়মনোবাক্যে। যে ভালবাসায় বিয়ে সত্য হয়, যে ভালবাসায় মেয়ে পুরুষের মিলন সার্থক হয়, সেই ভালবাসা বিয়ের বহু পূর্বেই সে অমলেশকে দিয়েছে। এক দেহ ছাড়া মন প্রাণ সে নিঃশেষে তাকে দান করেছে। বিয়ের পরও সে ভালবাসা সে তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেনি। আজো মনেপ্রাণে সে তারই প্রেয়সী। তারই প্রণয়িনী। সে-ই তার

ক্লান্তিকর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। তার বিড়ম্বিত জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে পারে একা সে-ই।

অমলেশের উপস্থিতির প্রতীক্ষা কমলের মনে একটা উত্তেজনার স্বাদ এনে দেয়। একটা নেশা ধরিয়ে দেয়। তার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়।

অমলেশের এই অপ্রত্যাশিত আগমন, কমলের মনে হয়, দৈবের ঘটনা। এ তার নিয়তির চক্রান্ত। নিয়তি তাকে তার কাছে টেনে আনছে। তার মাঝে বাঁচবার মন্ত্র আছে। সে-ই তাকে বাঁচাতে পারে।

কমল উত্তেজিত হয়ে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করে।

না। কোন উপায় নেই। বাঁচতে হলে তাকে অমলেশকে অবলম্বন করেই বাঁচতে হবে। নইলে আত্মহত্যা করতে হবে। জীবন্মৃত হয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। না। এ বন্ধন সে মানবে না। বিয়ের এই প্রহসনকে সম্মান দেবার জন্য নিজেকে সে তিলে তিলে ক্ষয় করতে পারবে না। অমলেশকে সে বলবে। অমলেশের কাছে সে আত্ম-সমর্পণ করবে।

দৈবাৎ সে অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা কাঁপুনি নামে। সে শাল জড়িয়ে জড়সড়ো হয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে। তার সর্বাঙ্গ হঠাৎ একটা বেদনায় অবসন্ন হয়ে এলো। স্তিমিত হয়ে এলো তার উত্তেজনা। নিস্তেজ হয়ে এলো তার দেহের প্রখর ঋজুতা। ছি, ছি এ-সব কী ভাবছে সে? সমস্ত স্নায়ু শিরায় ধিক্কার দিয়ে উঠলো কমলের। বিবাহিত হিন্দু কুলনারীর জন্মগত সংস্কার তাকে অনু পরমানুতে গ্রাস করে ফেলল। বিয়ে কখন মিথ্যে হয়? নারায়ণ শিলার সামনে অগ্নিসাক্ষ্য করে শাস্ত্র-সম্মত আচার অনুষ্ঠানের সিংহদ্বার দিয়ে পত্নীত্বের যে প্রতিষ্ঠা সে পেয়েছে, তার মহিমাকে কি একটা মোহের বশে ধূলোয় লুটিয়ে দেওয়া যায় নাকি? নিজের কাছে নিজেই যে লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে না। অমলেশের শ্রদ্ধাটুকুও চিরদিনের জন্য হারাতে হবে।

॥ ছয় ॥

মাঝের হলঘরে একখানা পালকের মত সাদা ধপধপে আলোয়ানে দেহ ঢেকে কমল স্থির হয়ে বসেছিল।

বাইরে কলরব শোনা গেল। পরিচিত দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। কমলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বুক দুরদুর করে উঠল। সে উর্ধ্বমুখে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাল. আমার মান রাখো ঠাকুর। আমায় বাঁচাও।

বিপাশার সঙ্গে অমলেশ ঘরে ঢুকলো। কমল উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল মৃদু হাসি দিয়েঃ এসো।

অমলেশ থমকে দাঁড়াল কমলের পানে চেয়ে। এ কি মূর্তি কমলের? তার সাদা কাগজের মত বিবর্ণ চেহারা দেখে অমলেশ বলে উঠলো, ব্যাপার কি? একি চেহারা হয়েছে?

কমল কেঁপে উঠল বাতাসের মুখে শুকনো পাতার মত। সে শীর্ণ মুখে শীর্ণতর হাসি ফুটিয়ে কম্পিত গলায় বললে, আমার ভাগ্যি ভালো। আমার চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক যে ত্রিসংসারে আছে, তা জানতুম না।

—আমি ছাড়া মাথা ঘামাবার লোক যে তোমার আছে, সে কথা মনে পড়িয়ে না দিলেও পারতে। চেহারা দেখে তোমার সেই পরমগুরুর কথা ভেবেই আমি চমকে উঠেছিলুম।

—কী রকম?

গ্রেট কোটটা খুলে অমলেশ একটা সোফায় বসল। বিপাশা উৎসুক দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকাল।

অমলেশ ভুরু কুঁচকে বললে, ঘরে ঢুকেই আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। এই সাদা আলোয়ানে সর্বাঙ্গ ঢেকে যে রকম জড়সড়ো হয়ে বসেছিলে, দূর থেকে আমার মনে হলো, এ যে সদ্য বৈধব্যের মূর্তি।

শিউরে উঠে কমল মুখ নিচু করল। বিপাশা জিব কেটে বলে উঠলো, মাগো, কী যে বলেন আপনি? মুখে কিছু বাধে না।

—দ্যাটস রাইট। মনে আমার যা আসে মুখে বলতে তা কোনদিন বাধে না। কমল হাড়ে হাড়ে জানে।

কপালে চোখ তুলে কমল নিঃশব্দে তার পানে তাকাল।

অমলেশ বললে, এই রুক্ষ এলোমেলো চুল। চুলের গহনে পত্নীত্বের রেড সিগন্যালটি পথ হারিয়েছে। চোখের কোলে কালি। মুখ বিবর্ণ। ঠোঁট দুখানা সাদা। তার ওপর ডুব দিয়েছো এই সাদা আলোয়ানের অতলে। দেখলে কার না মনে হবে—

কমল তার কথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে থামিয়ে দিল, থামো। বিপাশা, অন্য একখানা আলোয়ান দেতো।

কমল গা থেকে আলোয়ান খানা খুলে বিপাশাকে দিল। বিপাশা চোখে ঝিলিক দিয়ে ধমকের সুরে বললে, তুমি যেন কী? চুলটা পর্যন্ত আঁচড়াওনি।

অমলেশ সশব্দে হেসে উঠল: থাক না। বেশ তো দেখাচ্ছিল। ঠিক যেন শ্বেতপদ্ম পাপড়ি মেলছে।

কমল চোখের ইঙ্গিতে তাকে শাসাল। বিপাশা রয়েছে যে।

বিপাশা ভিতরে গেলে, অমলেশ বললে, আসলে তো তাই। মনের চেহারা তোমার মুখে ফুটে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি নিরেট নিশ্ছিদ্র দেয়াল উঠে যায়, সে তো বৈধব্যের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক।

—হলেই বা উপায় কি? এতো ভাঙবার ছেঁড়বার নয়।

—নয় কেন? উপায় তো করে দিয়েছে আমাদের নতুন রাষ্ট্র। কিন্তু তোমরা তো পারবে না। তোমাদের দেয়ালে মাথা ঠোকা ছাড়া উপায় নেই।

কমল মুহূর্ত তার মুখের পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। মাথা নিচু করে ব্যথিত ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, এসব কি সত্যিই তোমার অন্তরের গোপন ব্যথা না—

মুখ তুলে অমলেশের চোখে চোখ রেখে গলায় জোর দিয়ে বললে, না আমার মন্দভাগ্যকে বিদ্রূপ করছো ?

অমলেশ বোধ হয় নিজেকে হারিয়ে ফেললে। সে অতর্কিতে কমলের কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে ধমক দিল : কমলি !

কমল চকিতে মুখ ফিরিয়ে, ঘাড় তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাইল। ঘুমন্ত সাপ সাপুড়ের বাঁশীর সুরে ফনা তুলে জেগে উঠল। তার ডাকের যাদুমন্ত্রে তার সারাদেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এ ডাক তার রক্তের মাঝে অভিমানে মুখ লুকিয়েছিল। এ ডাক তাকে তার ভুলে যাওয়া কুমারী জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

কমল দৃপ্তভঙ্গিতে তার চোখে চোখ রেখে বললে, ও-নামে যাকে চিনতে সে অকেদিন মরে গেছে। স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে লাভ কী ?

— লাভ নেই তা জানি। সেই জানাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি। তোমার অদৃষ্টের কাছে হার মেনেছি বলে যে আমি তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবো এতোবড়ো পাষণ্ড আমাকে ভেবো না।

অমলেশের মুখে বিষাদের একটা করুণ ছায়া ঘনিয়ে এলো। সে পাইপটা দাঁতে চেপে ভাবাবেগ রোধ করল।

কমলের লুব্ধ চোখদুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। অমলেশের ভাবগতিক দেখে তার বুঝতে বাকি রইলো না যে ভিতরে যে সত্যটাকে সে জোর করে চাপা দিয়ে রেখেছিল, নিজের অগোচরে দৈবাৎ সে আবরন খুলে আপনাকে প্রকাশ করে দিল। কেন যে ওর মুখটি কমলকে এই দীর্ঘদিন অতোদূর থেকে এমন প্রবল শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করেছে আজ সে বুঝতে পারল। অথচ দৈবের এই অভাবনীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে তারা একান্ত দুর্বল ও শক্তিহীন। কমলের মন আলগা হয়ে এলো। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুরতা, এই অবিচার তার মনে আজ নতুন করে তীব্র হয়ে বাজল।

অমলেশ ছায়াচ্ছন্ন গম্ভীর মুখে পাইপ টানতে লাগল। আর কমল নিজের ভাবের ঘোরে মগ্ন হয়ে গেল। ভিতরে ভিতরে কিন্তু সে

গভীর আরাম বোধ করল। মনে হয় তার দুর্যোগভরা মনের আকাশের মেঘলা কেটে নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। মন তার দাক্ষিণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কারুর বিরুদ্ধে আর কোন নালিশ নেই তার মনে। এমন কি স্বামীর প্রতি তার উদ্ধত অবজ্ঞা ও ঘৃণা পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে।

অমলেশের মুখের ধোঁয়ার তালের সঙ্গে পিছলে এলো তার অবচেতন মনের আপসোস : সংসারে যার ওপর সব চেয়ে বড় অধিকার ছিল সেই গেল হাত ফস্‌কে ধূলোয় পড়ে।

কমলের চোখদুটি জ্বলে উঠল। সে সহসা অমলেশের হাতদুটি চেপে ধরে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের স্বরে বলে উঠল, যে অধিকার হাত ফসকে ধূলোয় পড়ে গেল, তাকে কী ধূলো ঝেড়ে মাটি থেকে তুলে নেওয়া যায় না, অমূ?

অমলেশ তার মুখপানে অবাক হয়ে চাইল। নিজের মনের চাঞ্চল্যে সে লজ্জিত হলো। ভয় পেল। একটু থেমে শক্তি সংহত করে বললে, যায় না শুধু আমাদের সমাজে। আমাদের সমাজ যে তোমাদের দেবী বানিয়ে রেখেছে। মানুষের অধিকারে হাত দিলে তোমাদের সতীত্বে আঁচড় পড়বে। গায়ে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। সে অগৌরব তুমি সইতে পারবে না।

কমলের মনটা সতর্ক ছিল না, তাই যে ভাবটাকে সে প্রাণপণে চেপে রাখতে চায় সেই ভাবটা দৈবাৎ উচ্চারিত হলো। সে অপ্রতিভ হয়ে প্রসঙ্গটায় ছেদ টেনে দিয়ে বললে, আমাকে আর 'কমলি' বলে তুমি ডেকো না। সম্পর্কের মান্য করো। আমি তোমার বড়ো। তুমি ছোট। তোমাকে আমি 'ছোট' বলে ডাকবো।

—তা ডেকো। তবে তোমার ও সম্পর্ক আমি মানি না। তোমার জীবনের যেটা মর্মান্তিক বিড়ম্বনা তারই জোরে তুমি আমার বড়ো হতে চাও?

কমল শূন্য চোখে ক্যাল ক্যাল করে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। কোন কথা বললে না। তার ভাল লাগলো অমলেশের শক্ত মুখের একগুঁয়েমি ভাবটি।

অমলেশ বিদ্রোহীর মত উত্তেজিত স্বরে বললে, তোমার সতীত্ব গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। স্বামী তোমার চোখে দেবতা হয়ে থাকুন। আমার কোন ক্ষোভ নেই। শুধু সেই স্বামীত্বের খুঁটি ধরে তুমি আমার বড় হতে চেয়ো না।

কমল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, রক্ষে করো। তুমি ক্ষেপো না।

—আমাকে ক্ষেপিয়ে দেয়, তোমার মুখের ঐ ব্যর্থতার বেদনা। তোমাকে হারিয়ে আমার যতো না দুখ্যু তোমার জীবনের নিষ্ফলতার বেদনায় তার চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণা। এখানে ফিরে যদি তোমায় সুখি দেখতে পেতুম আমি নিশ্চিন্ত হয়ে. নিজের জীবনে ফিরে যেতে পারতুম।

কমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তা'র ব্যথিত মুখের পানে তাকাল। আঁচলের খুঁটটা মাথায় টেনে দিতে দিতে হঠাৎ চোখ বুঁজে বললে, দুখ্যু লজ্জা রাখবার সংসারে আর ঠাঁই রইলো কোথায় ?

অমলেশ আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে তার মাথার চুলে হাত রেখে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, ঠাঁই রইলো আমা'র অন্তরে। ছোটবেলা থেকেই আমি তোমার কথা ভেবে এসেছি। তোমাকে কাঁদিয়ে এসে আমি নিজে কেঁদেছি। তোমাকে ভাবা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এখনো তেমনি আমাকে বইতে দিও তোমার দুঃখের বোঝা।

কমলের নিমীলিত চোখের কোণ বেয়ে দুটি অশ্রুর শীর্ণ ধারা নামল। তার মনের আকাশ আলোয় আলোয় ভরে গেল।

পরের দিন।

ভোর থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘোলাটে মেঘে আকাশ ভরে আছে। সীমারেখা কুয়াশায় ঝাপসা। শীতও বেড়েছে তেমনি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে হু হু করে। হাড়ে কাঁপুনি ধরে।

আজ আর বাইরের চাতালে বসে চা খাওয়া চলবে না। হলের ভিতর বিপাশা চায়ের টেবিল পাতিয়েছে। টেবিলটি রঙিন কভার

দিয়ে ঢেকেছে। মিনে করা জয়পুরী ফুলদানিতে চন্দ্রমল্লিকা আর গোলাপের গুচ্ছ দিয়ে পরিপাটি করে সাজিয়েছে।

এলোমেলো চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে পেছন পানে ঠেলতে ঠেলতে অমলেশ বাইরের মেঘলা আকাশের পানে চেয়ে বললে, বিশ্রী এই শীতের দিনের বিষ্টি। অনেকটা আমার মত অনাহূত অতিথি।

কমল বাঁকা চোখে মধুর হাসি ছিটিয়ে বললে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুঝি লাগলে ?

—মোটেই না। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি '

তার সুর করে বলার ভঙ্গি দেখে বিপাশা উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে হেসে উঠল। হাত ধরে বিপাশাকে টেনে নিয়ে পাশাপাশি বসে অমলেশ কমলের পানে চেয়ে বললে, আচ্ছা আগের চেয়ে আমি অনেকটা সভ্য-ভব্য হয়েছি, না ? সত্যি বলবে। মন রেখে কথা বলো না।

কমল হাসতে হাসতে বললে, মন রেখে কথা না বললে তো চাঁটি খেতে হবে ?

—ছি, সে-সব সত্যযুগের কথা। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন কি আর গায়ে হাত তুলতে পারি ? কি বলো খুকি ?

বিপাশা একট চাঁপারঙের গোলাপ কুঁড়ি অমলেশের বাটনহোলে গুজে দিতে দিতে গম্ভীর হয়ে বললে, আমার নাম বিপাশা।

অমলেশ তার গলার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠলো, বিপাশা পঞ্জাবের একটি নদি।

কমল চা ঢালতে ঢালতে বললে, হ্যাঁ। পাঞ্জাবেই যে ওর জন্ম।

—আই সি। তাই পাঞ্জাবীদের মত কড়া ধাত আর একরোখা।

—কী করে বুঝলেন ?

—ঐ যে খুকি বলতেই রুখে দাঁড়ালে।

—মাগো! ওর নাম বুঝি রুখে দাঁড়ানো ?

—তবে ?

চোখের কোণ দিয়ে কমলের পানে চাইলো অমলেশ।

কমল ভ্রুভঙ্গি করে হাসতে হাসতে বললে, কেন ওর সঙ্গে লাগছো।

অমলেশ টোষ্টের গায়ে ডিমের পোচ মাখাতে মাখাতে বললে, বেশ। তোমাদের আপত্তি থাকে খুকি বলবো না। বিপাশাই বলবো।

—আমি তার খুকি নই। সে বয়েস পেরিয়ে গেছে।

অমলেশ সুর করে বললে, বিপাশা পাঞ্জাবের একটি নদির নাম। বিপাশা বাঙলার একটি মেয়ের নাম।

কমল ও বিপাশার মিলিত হাসির কলধ্বনিতে প্রভাত বেলাটি আনন্দমুখর হয়ে উঠল।

অমলেশ বললে, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের এইখানে তফাৎ। মেয়েরা যতো শীগগিরী পারে বড়ো হতে চায়। ছেলেরা যদ্দিন পারে ছোট থাকতে চায়। মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে মুরুব্বিয়ানা করবার জন্যে হাঁসফাস করে। ছেলেরা রীতিমত মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেও হাফ-প্যাণ্ট ছাড়তে চায়না।

—তাই বুঝি?

কমল বললে, তা সত্যি মেয়েদের জীবন শীতের বেলার মত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। বেলা থাকতে সন্ধ্যা নেমে আসে। তাই তারা আলো ফোটবার আগেই দিনের জীবন সুরু করে।

বিপাশা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে কমলের মুখ পানে তাকাল। কমল যেন রাতারাতি তার আগের জীবনে ফিরে এসেছে। তার প্রাণখোলা প্রসন্ন হাসি, তার মুখের রক্তের জোয়ার, তার হরিণ চঞ্চল চোখের মুহুর্মুহু কটাক্ষ, তার শরীরের লাস্য বিপাশার চোখে অভিনব মনে হয়। মরা নদির বুকে হঠাৎ যেন বান ডেকেছে। দুর্যোগের মেঘলা আকাশে চাঁদ উঠেছে। ব্যর্থতার গ্লানি গেছে তার মুখ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

অমলেশও লক্ষ্য করলে। বিপাশাকে প্রশ্ন করলে, কমলের অসুখটা কী? মনস্তাপ ছাড়া আর কিছু?

—স্রেফ শোক আর পরিতাপ। এবার ছেলেটা মারা যাবার পর থেকে মনও ভাল হচ্ছে না. শরীরও সারছে না।

বিপাশা কমলের পানে কুটিল কটাক্ষ হেনে অমলেশকে বললে, আমার মনে হচ্ছিল ছোটবাবু আপনি যদি পুরোপুরি একটি হপ্তা আমাদের কাছে থাকেন রাঙাপিসির অসুখ সেরে যাবে। এই রকম প্রাণ খুলে হাসলে রোগ দেহ ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না।

—বিশি!

ধমক দিল কমল।

কমলের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

অমলেশ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সকালটা মাটি হয়ে গেল বিষ্টির জন্যে। নইলে খুব খানিক ঘুরে হাট বাজার করে আসা যেতো।

—সত্যি, ভারি বিশ্রী!

বিপাশা বললে।

অমলেশ বললে, ছাতা নিয়ে ম্যাকিন্টস এঁটে বিপাশা আর আমি যেতে পারি, কিন্তু তোমার এই অসুখ শরীর নিয়ে—

কমল বিপাশার পানে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কেন বিশি তো বললে, অসুখ আমার সেরে গেছে।

বিপাশা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল।

—হাসি তোমার বের করছি।

শাসালো কমল।

বিপাশা চলে যেতেই কমল অমলেশের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললে, তোমার জন্যে আমার মান ইজ্জত সব গেল।

অমলেশ গম্ভীর হয়ে বললে, চমকে দেয়ার চাইতে জানিয়ে রাখা ভালো।

—কী?

—কিছু না।

তির্যক ভঙ্গিতে তার পানে চেয়ে কমল বললে, হাড় দুষ্টু!

শূন্য উদাস দৃষ্টিতে বাইরের পানে চাইল অমলেশ।

কমল বললে, চলো। বাজার করে আসি। অনেকদিন তোমার সঙ্গে বেড়াই নি।

অমলেশ নিঃশব্দে তারপানে চাইল।

কমল জিজ্ঞেস করলে, কতোদিন তোমার সঙ্গে বেড়াইনি বলোতো?

—যদ্দিন হাতছাড়া হয়েছো।

—না। যদ্দিন তুমি কাছছাড়া। শেষদিন স্টেশনে গিয়েছিলুম তোমার সঙ্গে। তোমায় গাড়িতে তুলে দিতে। মনে আছে?

—গিয়েছিলে নাকি?

কমলের গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, হাঁ। ট্রেনে তোমার পাশে গিয়ে বসেছিলুম। তুমি স্বপ্ন দেখিয়েছিলে, ফিরে এসে, আমাদের বিয়ে হলে আমায় সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী ঘুরে আসবে।

অমলেশ হো হো করে হেসে উঠল। স্খলিত হাসির মধ্যে বলে উঠল, উঃ! কী মিছে কথাই বলতুম তোমার কাছে। যত সব আজগুবি বানানো গল্প-কথা। আর তুমিও তেমনি বিশ্বাস করতে।

—আমারি তো দোষ। আমারি তো—

বিপাশা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

রায়গড়ের ছোটবাবু।

সম্প্রতি বিলেত থেকে এসেছেন। উঁচুদরের চিত্রশিল্পী হয়ে এসেছেন। দোকানী ও স্থানীয় বাসিন্দারা উৎসুক চোখে তাদের দেখে আর কানাকানি করে।

হৈ হল্লোড়, হাসি গল্প করতে করতে ভিজে বাদলা পথে স্টেশন হয়ে তারা বাজার ঘুরে এল। অসময়ের এই বাদলধারা যেন তাদের অন্তরের প্রসন্নতা বাড়িয়ে তুলল।

ফেরবার পথে একসময় কমলকে নিজের ছাতার ভিতর টেনে নিয়ে অমলেশ বললে, আমরা দুজনে দুজনার কাছে স্বপ্ন হয়েই রইলুম।

—তা ছাড়া আর উপায় কী?

—মুছে ফেলতে পারো না কমল তোমার জীবন থেকে মাঝের এই ক-টা বছরের ব্যর্থতার ইতিহাস? পারো না নতুন করে জীবনকে গড়ে তুলতে?

কমল কম্পিত তপ্ত মুঠোর ভিতর অমলেশের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আমায় লোভ দেখিয়ো না অমু। নিজেকে আমি বিশ্বাস করিনা। আমাকে যা ভাবো আমি তা নই। কিন্তু—তুমি কী চাও?

—আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। তোমাকে সুখি দেখতে চাই।

বিকেলের দিকে অমলেশ কমলকে বললে, এ বাড়িখানা আমি রাখবো, কারণ এখানে আমার মার স্মৃতি জড়ানো আছে। মা আমার এই বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন, জানো তো?

অমলেশের এখানে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য এই পার্টিশনের ব্যাপারে কমলের মনোভাব জেনে নেওয়া। পুলকেশের সঙ্গে মনোমালিন্য প্রকাশ্য শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁচেছে। হয়ত আদালত পর্যন্ত গড়াবে। যত সহজে সমাধান হবে ভেবেছিল, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। ক্রমশই ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অমলেশ যে উৎসাহ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল সেটা ক্রমশই স্তিমিত হয়ে এলো কমলের বিপন্ন মুখখান কল্পনা করে। সে আঘাত করতে চায় পুলকেশকে। কমলকে নয়। কমলকে আঘাত করলে সে আঘাত নিজের বুকে এসে বাজবে। তাই কমলের মতামত না নিয়ে কোন কিছু করতে চায় না।

কমল নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল।

—তোমার কোন আপত্তি নেই তো? অমলেশ জিজ্ঞেস করলে।

—আমার আবার আপত্তি কিসের?

—তোমার কর্তা কিন্তু ঘোরতর আপত্তি তুলবে। আমি কোন কিছু বিশেষভাবে চাইলে, সেখানে আপত্তি উঠবেই এবং সেটা রক্ষা করতে হলে আমাকে নিশ্চয়ই খুব চড়া দাম দিতে হবে।

কমল হাসল। জিজ্ঞেস করল, আর আমি যদি আপত্তি করি?

—তৎক্ষণাৎ আমার ইচ্ছা বাতিল ও নামঞ্জুর হবে।

আরক্তমুখে কমল প্রশ্ন করলে, এটাকে কী বলবো উদারতা না পক্ষপাতিত্ব?

—নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

—তা যদি করো, আমি বলবো সেটা তোমার কাপুরুষতা। তোমার সম্পত্তি, তোমার দাবি ছেড়ে দেবে আমার মুখ চেয়ে? তা কখখনো করো না। ভালোবাসা হাত পেতে দান নেয়, ধোঁকা দিয়ে নেয় না। দোহাই তোমার, তোমাদের এই ভাগবাটরার ভেতর আমাকে জড়িয়ো না। দূরে থাকতে দাও।

অমলেশ নিঃশব্দে কমলের মুখের পানে চাইল। সে মুখ বাইরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতই বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত।

॥ সাত ॥

পুলকেশ চোখ কান বুজে অনিতার যৌবনের রঙিন নাগর-দোলায় পাক খাচ্ছে। কাজের ছুতো করে হপ্তাখানেক অনিতাকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে নিজেদের কয়লাখনি অঞ্চলে ঘুরে এল। নতুন প্রণয়। মধুচন্দ্রিকার প্রয়োজন আছে বই কি। দীর্ঘ নিভৃত সান্নিধ্যের রোমাঞ্চ অন্তরঙ্গতাকে নিবিড় করে তোলে। অনিতাকে একান্ত করে নিজের মাঝে সর্বক্ষণ পাবার জন্যই এই দুরন্ত প্রয়াস। আর সকলের কাছ থেকে তাকে আড়াল করে সে তার দেহ মনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তাকে নিজের ভোগে লাগাতে চায়। অনিতা নিজের স্বাধীন সত্তা লুপ্ত করে দিয়ে তারি নারী হয়ে তার মাঝে ঘুমিয়ে থাকুক। যেখানে তার একাধিপত্য ছিল সেখান থেকে পুলকেশ হটে এসেছে। উপবাসী দেহমন অনিতার পুষ্পিত যৌবনের স্বাদ পেয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে। কমলকে না পাওয়ার অভাব তার মনে কাটার মত বিঁধে ছিল। অনিতা সে কাঁটা তুলে দিয়েছে।

অনিতারও ভাল লাগে। ঝকঝকে মোটরের বুকে সাজপোষাক করে পুলকেশের পাশে বসে দূর অজানা পথে এই অভিযান। বেশ লাগে অনিতার। ভাল লাগে তাকে খুশি করবার পুলকেশের এই ব্যাকুলতা। তার তৃপ্তির জন্য, তার আনন্দের জন্য এমন ধনবান, বলবান ও রূপবান পুরুষের এই অকাতর আয়োজন। ভাবতেও তার মনে দোলা লাগে। পুলক জাগে। সার্থক তার রূপযৌবন। সে গর্ব করতে পারে বই কি! এত বড় বিজয়ের গৌরবে উল্লসিত হয়ে ওঠে না কোন মেয়ের মন?

কিন্তু এই কি সুখ? অনিতা থেকে থেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে। এই সুখের কামনায় কি সে এই দীর্ঘদিন নিষ্ঠুর অদৃষ্টের সঙ্গে

লড়াই করে এসেছে, অনশনে, অনিদ্রায়, পথের ধারে, আকাশের নিচে? না। সে-সব দুঃখ স্মৃতির কথা ভেবে আর লাভ কি? তখন তো আর এ সুযোগ সুবিধা মেলেনি। প্রতিকূল ভাগ্য আজ অনুকূল। স্বেচ্ছায় বরদান করেছে। ভাগ্যের সেই আশীর্বাদ আঁচলে বেঁধে সে পথ চলবে।

মোটর ছুটতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে আলো-ছায়া আঁকা বিসর্পিল পথ দিয়ে। পথের ধারে রবিশস্যের চৌকো ক্ষেত। সর্ষের হলদে ফুলে ফুলে ভরে আছে। মাঠের বুক চিরে কোথাও ঝির-ঝির করে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। আকাশে রঙের মেলা। সাদা মেঘের মত ঝাঁক ঝাঁক বক উড়ে যায় দিগন্তের কোল ঘেঁষে, নিরুদ্দেশ মনের কামনার মত।

গাড়ির বুকে শিথিল দেহ এলিয়ে দিয়ে আকাশের পানে বড় বড় কালো চোখ মেলে অনিতা ভাবতে থাকে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তারি রক্তচ্ছটায় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পুলকেশ তার গায়ে গা দিয়ে বসে আছে। সেই স্পর্শসুখেই সে বিভোর। আকাশের চিতাবহ্নির পানে চেয়ে অনিতার মনে হয়, সে-ও ওই আকাশের ক্ষণস্থায়ী রক্তিমাভার মত মেঘের স্তরে ক্ষণিকের আশ্রয় নিয়েছে। একটু পরেই রঙ মিলিয়ে যাবে। নেমে আসবে তাল তাল কালো অন্ধকার।

কালোই তো চিরস্থায়ী, অভিজাত কালো রঙ।

অনিতা মনে মনে হাসে। হোক না এ-স্বপ্ন ক্ষণিকের। থাক না যতক্ষণ থাকে স্বপ্নের ঘোর। ভাল লাগে তার এস্বপ্ন। চোখের কালো পাতার আড়াল দিয়ে সে পুলকেশের পানে চেয়ে দেখে। তার জন্য মনে ওর রঙ ধরেনি। একটা স্থূল আসক্তি অবশ্য আছে। আসক্তিটা দেহকেন্দ্রিক। হোক না। অনাদিকাল ধরে রূপ আর দেহই তো নারীকে পুরুষের চোখে মূল্যবান করেছে। বাকিটা তো অলঙ্কার। কাব্য।

পুলকেশ তার শরীরে একটা গভীর বিশ্রামের স্বাদ এনে দিয়েছে।

বড়লোকের বাড়ির ঝি-চাকর ঢেউয়ের বুকের ফেনা। মনিবের জীবনযাত্রার চাবিকাঠি যাদের হাতে তারা কেন সিঁদ কাঠির খোঁজ করবে? এর মাঝে আর নতুনত্বই বা কি আছে? ধনীর ঘরে এ-রকম সদর মকস্বল থাকবে বই কি! ওদের জীবনেই তো বৈচিত্র্য থাকবে। খেলবে রঙের জোয়ার-ভাটা। অনিতার সম্পর্কটা দাসদাসীর মধ্যে অজানা রইল না। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপারটাকে তারা গ্রহণ করল এবং অনিতাকে মনিবের পর্যায়ে তুলে দিল। বাড়ির গৃহিনীর চেয়ে বাইরের গৃহিনীর গুরুত্ব তাদের কাছে কম নয়। অনিতার এ বাড়িতে যাতায়াত আগে থেকেই অবারিত ছিল, কাজেই সে সম্বন্ধে নতুন করে কারুর মনে কোন প্রশ্ন জাগল না।

অমলেশ সম্প্রতি বাড়িতে এসেছে। নিচের বৃহৎ একটা হল ঘরে তার স্টুডিয়ো করেছে। প্রায় সারাদিন সে সেই ঘরেই থাকে। ভিতরে আসে খেতে আর উপরে যায় শুতে।

ক-দিন শীতটা পড়েছে খুব জোরে। কুয়াশার ঘোরে আকাশ চোখে পড়ে না। বিকেল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামল। সন্ধ্যার দিকে অমলেশ উপরে উঠে এলো পোষাক বদলাতে। বিপাশা যে-ঘরে পড়া-শুনা করত তারি সামনের বারান্দা পেরিয়ে যেতে হয় অমলেশের ঘরে। বিপাশার ঘরের ভিতর দিয়েও যাওয়া চলে। সেটা সর্টকাট। বৃষ্টির জন্যই হয়তো বা অমলেশ বারান্দা ঘুরে না গিয়ে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে বিপাশার ঘরের দরজাটা খুলে ফেললে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পুলকেশ ও অনিতাকে এমন একটি মধুর প্রচ্ছন্নতার মধ্যে দেখল যে লজ্জায় তাকে পিছু হাটতে হল। নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে অমলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কানে গেল চাপা গলায় পুলকেশ বলছে, ইডিয়ট।

অমলেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললে, আই অ্যাম রিয়ালি সরি। সঙ্গে সঙ্গে অনিতার পানে চেয়ে বললে, এক্সকিউজমি।

তার মুখের চাপা হাসি আর অনিতাকে উদ্দেশ করে কথা বলায়

পুলকেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বললে, গেট আউট। গেট আউট ইউ রাশক্যাল!

অমলেশ সশব্দে হেসে উঠল। সে হাসি তরল আগুনের ঢেউ-এর মত পুলকেশের গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

অমলেশ পরিহাস তরল কণ্ঠে হাসতে হাসতে বললে, কানচ্ ইউ টেক ইট অ্যাজ এ কান্, মাই বয়?

পুলকেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে একটা ভারী কাচের পেপার-ওয়েট তুলে নিয়ে অমলেশকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। অমলেশ কিন্তু বলের মত অবলীলায় সেটা বাঁ-হাতে লুফে নিয়ে উচ্চৈস্বরে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘটনাটার উপর অবশ্য সেইখানেই যবনিকা পড়ল। অমলেশের কৌতুকী উদার মনে রেখাপাত করতে পারল না। এটা মনে করে রাখবার মত এমন কিছু সঙিন ব্যাপার নয়। শুধু মনে পড়ল তার কমলকে। বেচারী কমল!

অমলেশের চেয়ে পুলকেশকে কেউ ভাল করে চেনে না। তার এই রূঢ় আচরণকে সে সাবানের ফেনার মত ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল।

অনিতা পাথর হয়ে গেছে নিজের এই মর্মান্তিক অপমানে। এর জন্য যে পুলকেশই দায়ি সে-কথা সে ভুলতে পারে না। এমনি নির্লজ্জভাবে নিজের মর্যাদা খুইয়ে সে মাথা তুলতে পারলে না। মাথা হেঁট করে নিস্পন্দের মত কিছুক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্র পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পুলকেশ তাকে ডাক দিল, অনিতা, নিতা—

অনিতা সাড়া দিল না। তারপানে ফিরে তাকাল না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

এর পর বাড়িতে সে যে আর আসবে না পুলকেশের বুঝতে বাকি রইল না। পরের দিন অনিতা আপিসে এলো না।

সারাদিন একটা অস্বস্তিকর ছটফটানির মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে পুলকেশ বিকেলের দিকে ড্রাইভারকে গোপনে অনিতার খবর আনতে পাঠাল। ড্রাইভার এসে সংবাদ দিল, সে বাড়ি নেই। ঘরে তালা বন্ধ।

পুলকেশের বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। অনিতা তার বিস্ময়কর আবিষ্কার। তাকে সে হারাতে পারবে না। কিছুতে না। তার জীবনে অনিতার আগমন এতটা অসাধারণ ঘটনা। তার প্রত্যাশার অতীত। তাকে নিয়ে সে নতুন করে নীড় বাঁধবে।

পুলকেশের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। তুফানের মুখে সে নিজেকে খাড়া রাখতে পারল না। অনিতার সঙ্গকামনা তাকে পাগল করে তুলল।

আপিস থেকে বেরিয়ে সে বাড়ি গেল না। অনিতার বাড়ি গেল।

অনিতার বাড়ি সে কখন দেখেনি। কখন যায়নি।

এই সন্ধ্যার অন্ধকারে, সেখানে এ-ভাবে যাওয়া হয়তো অশোভন। কিন্তু প্রয়োজনের নীতি নেই।

একটা আধ-আঁধার সঙ্কীর্ণ গলির মুখে গাড়ি রেখে ড্রাইভার বললে, ঐ গলির ভেতর বাড়ি। অনেকখানি পথ। আমি বরং দেখে আসি বাড়ি ফিরেছেন কিনা।

পুলকেশ সম্মতি জানিয়ে বললে, যদি ফিরে থাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। বলবে বাবু গাড়িতে বসে আছে।

—জী!

মনে মনে হাসির তরঙ্গ তুলে ড্রাইভার চলে গেল। গরজ বড় বালাই। পুলকেশ নিজেকে এমন ভাবে কোনদিন খাটো করেনি। কিন্তু উপায় কি? পুলকেশের মনের মাঝে কেমন খটকা লেগেছে, আজ রাত্রে অনিতাকে ফেরাতে না পারলে, তাকে হারাতে হবে। তাই সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। যেমন করে পারে তাকে সে ফেরাতে চায়, এই রাত্তিরে। তার জন্য নিজের মান সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধা নেই। তাকে ফিরে পাবার জন্য কোন মূল্য দিতেই তার কার্পণ্য নেই।

গাড়ির অন্ধকার কোণে বসে গত সন্ধ্যার ঘটনার ছবিটা মনে ভেসে উঠতেই মন তার বিকল ও বিস্বাদ হয়ে গেল। একটা দুর্জয় আক্রোশে সে অমলেশকে লোপ করে দিতে চাইল। সে এই অশান্তির মূল। এমন করে আর চলতে পারে না। এমনি লুকোচুরি করে আর কতোদিন চলবে। রাতের আশ্রয় একটা চাই। যেখানে সে নির্বিরোধে নিঃসঙ্কোচে অনিতাকে নিয়ে রাত্রিবাস করতে পারবে। এমন করে চলতে পারে না। আজ বাগানে, কাল হোটেলে। পলাতকের মত রাতের আশ্রয় খুঁজে বেড়ানো। প্রাত্যহিক ব্যাপারে এতো চক্ষুলজ্জার কোন মানে হয় না। একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় একটা সংসার পাততে হবে। রাতের সংসার। দিনান্তের বিশ্রাম।

অনিতা তার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অনিতাকে বাদ দিয়ে জীবনের কোন স্বাদ থাকবে না। মধু থাকবে না। অনিতাকে তার চাই। লোকনিন্দার সে পরোয়া করে না। কমলকে সে গ্রাহ্য করে না।

অনিতা এলো। ধীরপায়ে নিঃশব্দে এসে গাড়িতে বসল। তার মুখের চেহারা দেখে পুলকেশ দমে গেল। মুখ তার শুকনো, শক্ত। চোখের কোলে কালো রেখা। চুলগুলো এলোমেলো। শ্রাবণ আকাশের মত মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। চোখ দুটো ঈষৎ লাল।

নিঃশব্দে পুলকেশ তার পানে চাইল। নিঃশব্দে ড্রাইভারকে চোখের ইঙ্গিত করল। নিঃশব্দে গাড়ি এসে একটা কুলীন হোটেলের দরজায় থামল।

হোটেলের নিরালা ঘরে বসে অনিতা কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, এমনি ভাবে আমাকে নিয়ে দিনদুপুরে মাতন করলে, হয় আমাকে বিষ খেতে হবে নয় এখান থেকে পালাতে হবে। তোমার ভাবগতিক দেখে সত্যিই আমার ভয় হয়েছে।

পুলকেশ তাকে বাধা দিল না। প্রতিবাদ করল না। খাবারের অর্ডার দিল বয়কে।

অনিতা বললে, আমাকে তুমি কী চোখে দেখ জানি না। দেহ বিক্রী করা আমার পেশা নয়। ভুল করেছি বলে তুমি আমার মানসম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারনা।

মনে মনে হাসল পুলকেশ। বললে, তোমার বলা শেষ হলে, আমাকে দয়া করে বলতে দিও। আর আগে বাথ-রুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে কিছু খেয়ে নাও। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে,সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি।

প্রেমাসক্ত পুরুষ যখন নারীর কাছে নতি স্বীকার করে করুণা ভিক্ষা করে, নারী তখন অসহায়। শক্তিমান পুরুষ যখন নিজেকে খর্ব করে দুর্বল চিত্তজ্বালার ছবিটি নারীর চোখে তুলে ধরে, তার বিরোধী মনের তট ভেঙ্গে যায়। প্রণয়ী যখন হৃদয়ের অযাচিত দান নিয়ে নারীর পদতলে নিবেদন করে, তখন সে পারে না সে দান প্রত্যাখ্যান করতে।

অনিতাও পারল না।

পুলকেশ পৌরুষ গর্বে ঘোষনা করার ভঙ্গিতে বললে, আর তো মনে লজ্জার আবরণ নেই। দ্বিধা সঙ্কোচ নেই। এইবার আমরা দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বো। খোলাখুলি ভাবে তোমাকে নিয়ে একটা নতুন সংসার পত্তন করবো। কালই আমি চৌরঙ্গি অঞ্চলে একটা ভাল ফ্লাট ঠিক করতে বলবো। তারপর দেখেশুনে একটা ছোট বাড়ি কিনে দেবো তোমার নামে। এভাবে আর চলতে পারে না। একটা আস্তানা আমাদের চাই। তোমাকে নিয়ে আর পথে পথে ঘুরতে পারবো না। তোমাকে আমি আপন করে পেতে চাই। সারা জীবনের জন্য পেতে চাই।

কুটিল বাঁকা চোখে ঠোঁট ফুলিয়ে অনিতা বললে, বউরানিকে কি তালাক দেবে নাকি?

—পারলে খুশি হতুম নিতা। জীবনকে নতুন করে গড়তে পারতুম।

খেতে খেতে মুখ নিচু করে অনিতা বললে, পুরুষ তোমরা সব পারো।

পুলকেশ বললে, পারিনা শুধু কোন নিরীহ মেয়েকে নিজের ভোগে লাগিয়ে পথে ছেড়ে দিতে। আমাকে যে বিশ্বাস করে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে আমাকে তার সে বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে প্রাণ পণ করে। তার জন্যে যদি অন্যের ওপর কিছু অন্যায় করতে হয় করতে হবে।

অনিতা নিঃশব্দে তারপানে মুহূর্ত চোখতুলে তাকাল।

পুলকেশ গদগদ হয়ে বললে, তোমাকে পাওয়া আমার জীবনে একটা পরম সৌভাগ্যের ঘটনা। আমার বিড়ম্বিত জীবনে যে আবার সত্যিকার ভালোবাসার স্বাদ পাবো এ আমি ভাবতেও পারিনি। সত্যিকার মিলন আমার জীবনে মিথ্যে হয়ে দেখা দিল। আর তোমার মিথ্যা আমার জীবনকে সত্যিকার আলোয় ভরিয়ে দিল। আমাকে সার্থক করে তুলল।

পুলকেশের অব্যর্থ তোষণের মোক্ষম তীর অনিতা বেচারীকে ধরা-শায়ী করে দিল। তাকে মাথা তুলতে দিল না। তার অপমানিত বিরোধী মনের সমস্ত সঙ্কল্প চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল। পুলকেশের প্রতি করুণায় আবার তার মন ভরে উঠল। ভুলে গেল সে নিজের অপমান। তাকে বিষ খেতে বা দেশত্যাগী হতে হলো না। মন আবার ভারমুক্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। চোখে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অধরে হাসি চমকে উঠল। গলার গমক বাড়ল। পাখা ঝাপটা দিয়ে কুক্কুটির মত সে আনন্দ মদির হয়ে উঠল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়ির ট্যাঙ্ক ভরতি হলো পেট্রোলে। সুরু হলো দূর পথে তাদের নৈশ অভিযান। রঙিন ফাঁস গলার ফাঁসি হয়ে চেপে বসল।

পুলকেশ মত্ত হয়ে উঠল। তার চেতনা থেকে জগৎ সংসার বিলুপ্ত হয়ে গেল। তার মনে পড়ল না যে ভোরে কমল এসে বাড়ি পৌছবে, শিমুলতলা থেকে।

অনিতা প্রসঙ্গ শিমুলতলাতেই কিছুটা কমলের কানে ভেসে গিয়েছিল। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। এখানে এসে তার সংশয় নিরসন

হলো। সে বিস্মিত হলো না। বিচলিত হলো না। নিজের জন্য মনে তার কোন ক্ষোভ দেখা দিল না। ব্যথিত হলো সে অনিতার কথা ভেবে। তার সম্বন্ধে সে একটা উচুঁ ধারনা পোষন করে এসেছে। তাকে সে ভালো মেয়ে বলেই জানে। তাকে তার ভালো লাগতো বলেই সে তাকে বরাবর সাহায্য করে এসেছে। সে নিজেকে এমন ভাবে হারিয়ে ফেলল কেমন করে? কিসের দুর্বলতায়? কিসের লোভে?

রাগ হলো পুলকেশের উপর। একটা নিষ্কলুষ সরলা মেয়েকে লুব্ধ করে এমনভাবে পাপের পথে টেনে নিয়ে গেল কেমন করে? পুলকেশ সম্বন্ধে কমলের মনের মাটি ছিল নিরেট পাথুরে। ঘৃণা ও বিদ্বেষে জমাট। কিন্তু সে যে এতো ছোট, এমন ভয়াবহ কুৎসিৎ ধারণা ছিল না। কামনার আবর্তে সে যে নিজের আভিজাত্য, বংশমর্যাদা ডুবিয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুস্থ ভদ্রঘরের কুমারী মেয়েকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে দ্বিধা করবে না, এতটা সে ভাবতে পারে নি।

পুলকেশের রক্তের ছন্দই যেন আলাদা। বংশ ছাড়া। গোত্র ছাড়া।

কমলের মনটা ঘৃণায় পাথর হয়ে গেল।

অনিতা আর এ বাড়িতে আসে না। তবে আপিসে আসে। সে খবর কমল পায়। কমল ভেবেছিল তাকে দেখতে, বিপাশার সঙ্গে দেখা করতে হয়তো একদিন সে আসবে। কিন্তু সপ্তাহ কেটে গেল। সে এলো না।

বিপাশা তার মনের বিরাগ চাপতে পারলে না। বললে, আসবে কোন্ মুখে? এলে আমি অপমান করবো।

কমলের কিন্তু তার উপর করুণাই হয়। সে অস্ফুটস্বরে বলে, অনিতার মত মেয়েকে কী শক্তি দিয়ে কিসের প্রভাবে যে জয় করল তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। মেয়েটাকে শক্ত বলেই জানতুম।

ঠোঁট উলটে বিপাশা বললে, ছাই। শক্ত না হাতি। স্রেফ পয়সার লোভ, আবার কী?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমল বললে, আমাদের এখানে এসে মেয়েটা যদি ভেসে যায়, আমরা যে নিমিত্তের ভাগি হবো বিপাশা!

— কিন্তু আমরা কি করতে পারি বলো। কচি খুকিটি তো নয়। আর ওর তো এখন অদেষ্টের জোয়ার এসেছে। পরমানন্দে আছে। থিয়েটার রোডে নতুন ফ্ল্যাট নিয়ে নতুন সংসার পেতেছে। নতুন খাট বিছানা হয়েছে। নতুন ড্রেসিং টেবিল। আলমারী। গায়ে সোনার গয়না। ভোল বদলে গেছে। রাত্রে দু-মানুষের খাবার জন্যে একটা বাবুর্চি রেখেছে।

কমল হাসতে হাসতে তার গায়ে লুটিয়ে পড়ল: তুই এতো খবর পেলি কোথা থেকে?

—আমার স্পাই আছে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কমল বললে, শুধু আমার জানতে ইচ্ছে করে, নিতা ওকে ভালোবাসে কিনা।

—জেনে কি হবে?

মুখখানা বিকৃত করল বিপাশা।

কমল সশব্দে হেসে উঠল: তা হলে ওদের বিয়ে দিয়ে দেবো।

স্খলিত উদ্দাম হাসি। হাসির তোড়ে বিপাশা হাঁপিয়ে উঠল। সে ভয় পেল।

॥ আট ॥

কমল আর পুলকেশের দাম্পত্য অকাতর হলেও তার প্রকাশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে না। নিয়ম নিষ্ঠার দিক থেকে কমল অবিচলিত। অকম্পিত। সকালে পুলকেশের খাবার সময় পূর্বের মতই একবার কাছে এসে বসে। আপিস যাবার সময় একবার কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রাণ থাক না থাক অভ্যাস বশে পূজায় বসার মত সে স্ত্রীর কর্তব্য করে যায়। দুজনে কাছাকাছি হলেও মাঝের দূরত্ব কমে না। কারুর মনে কোন অনুভবের ঢেউ ওঠে না। দুজনের মাঝে একটা অকায় স্তব্ধতা নিরেট পাথরের অদৃশ্য দেয়াল তুলে দাঁড়ায়।

আর কতটুকু সময়ই বা পুলকেশ বাড়িতে থাকে। রাত্রে তো বাড়ি থাকে না। আপিস থেকে ফিরে বড় জোর ঘণ্টাখানেক বাড়িতে এ-ধার ও-ধার করে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা'ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাতের আহার অনিতার কাছে। রাত্রিবাস অনিতার কুঞ্জে। সকালে আবার বাড়ি ফেরা। আপিসের গ্যারেজ থেকে গাড়ি যায় ভোরে তাকে আনতে। সকালের খাওয়াটা বাড়িতে। নির্লজ্জতাটা রীতিমত স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে বাড়ির কর্তা। সে আবার পরোয়া করবে কাকে? ভয় ছিল, সমীহ ছিল এতোদিন কমলকে। সেটা বোধ হয় তার শরীরের উপর লোভ ও মোহ ছিল বলে। এখন যেন সে তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই এতটা বেপরোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। এর জন্য কমলের গোপন মনে কোন বিক্ষোভ নেই। বরং সে কিছুটা আশ্বস্ত। রাত্রে তাকে পুলকেশকে সঙ্গ দিতে হয় না। তার ক্লেদাক্ত কামনার আগুনে তাকে পুড়তে হয় না। সে দেহমনে একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

কিন্তু সংসারের পাঁচজনের কাছে তার নারীত্ব খর্ব হয়েছে। পত্নীত্ব হয়েছে অপদস্থ। তাদের দুজনের মাঝের বিভেদটা যেন নগ্ন হয়ে লোকচক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কমলের মনে হয়, এ-যেন তাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার মতই একটা প্রচণ্ড আক্রোশ। যেন খোলাখুলি সে তার সঙ্গে বিরোধ করতে চায়। স্বামীর ভাবগতিক দেখে সত্যই কমল চমকে গেছে। এত সাহস তার হলো কেমন করে? কিসের জোরে? এ-যেন তাকে সে তার সম্মানের আসন থেকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে। তার পারিবারিক মর্যাদা কেড়ে নিচ্ছে।

বিপাশা বলে, এই রকম মুখ বুজে থাকলে দুদিন পরে নতুন বউরাণী এসে পুরনো বউরাণীকে আউট করে দেবে।

কমল মুখে হাসে। মনে মনে ঝলসে ওঠে। ভিতরে একটা বহ্নিশিখা লেলিহান হয়ে ওঠে।

হিংসা নয়, লোভ নয়, বঞ্চিতের ক্ষোভ নয়। অপমানের একটা দুর্বিষহ জ্বালা তার বুকের নিচেটা পোড়াতে থাকে।

সে মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

স্বামীর উপস্থিতি সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। তার প্রতি তার ঘৃণার চেহারাটা যেন কদাকার আর ভয়াবহ হয়ে উঠছে। স্বামীর ঘৃণিত স্তব্ধতার অন্তরালে একটা অটল সঙ্কল্পের ও তীব্র অপমানের প্রচণ্ডতা সে অনুভব করে। যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকে তার ভাবগতিক দেখে কমলের মনে হয়, সে যেন তাকে খর্ব করতে পেরে মনে মনে উল্লসিত। এমনি খুশির ভাব দেখায়, এমনি মুখ উজ্জ্বল করে হাসে আর এমনি আত্মপ্রসাদের চোরা চাউনিতে তার পানে তাকায় যেন সে বোঝাতে চায় যে সম্প্রতি সে অত্যন্ত সুখি। অনিতার সঙ্গ ও সাহচর্য তার জীবনকে মধুময় করে তুলেছে। সে যা পারেনি। তার প্রতি অবজ্ঞাটা তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে ওঠে।

তার এই তুলনা-মূলক বিদ্রূপের হীন কটাক্ষ কমলকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। একটা চাপা রাগে তার হৃদয় ঝলসে

যায়। সে সব কিছু তচনচ করে দিয়ে এ ঘৃণিত বন্ধন থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। সে সহ্য করতে পারে না এই কুৎসিৎ বন্ধন। মন তার বিষিয়ে উঠেছে। সংসারের উপর আর তার মায়া মমতা নেই। সে সংসারকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চায়। সম্মান হারিয়ে আধিকার হারিয়ে সে সংসারের গৃহিনী সেজে থাকতে চায়না।

সত্যিকার জীবন সে কোনদিন পায়নি। পেয়েছিল সে পত্নীত্বের সম্মান। স্বামীর পারিবারিক মর্যাদা। একটা সংসারের কর্তৃত্ব। সে অধিকারও সে হারাতে বসেছে।

স্বামীর অনুগ্রহ ভিখারী হয়ে তার সংসারে সে বাস করবে না। যে স্বামীকে সে কোন দিন ভালবাসতে পারেনি। যে-স্বামী তাকে জয় করে নিতে পারেনি।

এ বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে চায়। এ বন্ধন তার কাছে একটা দুঃসহ বিভীষিকা।

—আমি অনিতাকে ফোন করে এখানে আসতে বলেছিলুম। তুমি নাকি তাকে আসতে মানা করেছো?

রূঢ়স্বরে প্রশ্নটা করে কমল কঠিন ভাবে পুলকেশের দিকে চাইতেই সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে বিমূঢ় দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চেয়ে বললে, কেন কি হয়েছে?

—হবে আবার কী? আমি জানতে চাই তুমি তাকে আসতে মানা করেছো কি না?

কমলের গলার তীক্ষ্মস্বরে, তার কঠিন আদেশের ভঙ্গিতে পুলকেশ শিউরে উঠল। চকিতে সে কমলের মুখপানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কোন উত্তর না দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কমল তার পথ আগলে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, কথার উত্তর না দিয়েই চলে যাচ্ছো যে?

পুলকেশ চিরদিনই কমলকে ভয় করে এসেছে। স্ত্রীর সামনে সে

নিজেকে ছোট করেই দেখেছে।

কমল দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল। পাছে কেউ ঘরে এসে পড়ে।

পুলকেশ কম্পিত গলায় প্রশ্ন করল, তোমার হয়েছে কি?

কমল অপূর্ব গ্রীবা ভঙ্গি করে দৃপ্ত কণ্ঠে বললে, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তারপর বলছি।

পুলকেশের বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে উত্তর দিল, হ্যাঁ, করেছি। কেন?

—আমার উত্তর আমি পেয়েছি। আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করো না। সে না এলে আমাকেই যেতে হবে তার কাছে।

—কেন?

ভয় পেল পুলকেশ। তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ কমল একটা কৌচে বসে ইঙ্গিতে পুলকেশকে বসতে বললে।

পুলকেশ অভিভূতের মন তার সামনে আর একখানা চেয়ারে বসল।

কমল কোন ভূমিকা না করেই সরাসরি বললে. তুমি অনিতাকে বিয়ে করো।

কথাগুলো চাবুকের মত পুলকেশকে তীব্র আঘাত করল। সে আঘাতটাকে হাসি দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করল।

কমল ধমকের সুরে বললে. হাসির কথা নয়। একটা মেয়ের জীবন মরণের কথা। তার জীবন নষ্ট করে তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার অধিকার তোমার নেই। এতো বড় পাপ ধর্মে সইবে না। শুধু তোমার পাপ নয়। সংসারে পাপ।

পুলকেশ চোখ মিটমিট করে তার পানে চেয়ে হাসল। কোন উত্তর দিলনা।

কমল একটা অঙ্গভঙ্গি করে অধৈর্যের মত বললে, কি বলছো-করবে? বলো তা হলে আমি ব্যবস্থা করি।

—তুমি কি ব্যবস্থা করবে?

হাসল কমল। বিদ্রূপের স্খলিত হাসি। বললে, আমি না হলে কে তোমার বিয়ে দেবে? আমি ছাড়া কি তোমার গতি আছে নাকি। আমি না মুক্তি দিলে তুমি আবার বিয়ে করবে কেমন করে?

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলে, তার মানে?

—মানে খুব সহজ। আমাদের বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে তুমি অনিতাকে বিয়ে করবে। আইন আমাদের সে অধিকার দিয়েছে।

বাঁকাচোখ দুটি কপালে তুলে পুলকেশ প্রশ্ন করলে, আর তুমি? তুমিও কি বিয়ে করবে নাকি?

গম্ভীর গাঢ়স্বরে কমল উত্তর দিল, করতেও পারি। বাধা তো নেই।

—কাকে? ছোটবাবুকে নাকি?

কমলের গায়ে তীব্র অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছে পুলকেশ। সমস্ত শরীর তার জ্বালা করে উঠল। সে রাগে অন্ধ হয়ে গেল। তবু সে বাইরেটাকে যথাসাধ্য শান্ত রেখে বললে, বলা যায় না। এখনো সে কথা ভাবিনি। তবে ছোট যদি রাজী হয় আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করবো।

হেসে উঠলো পুলকেশ। সে মনে শক্তি পেয়েছে। সাহস পেয়েছে। কমলকে আঘাত করবার প্রেরণা পেয়েছে। অনেক দিনের পুঞ্জিত ব্যর্থতা যেন ছিদ্র পেয়ে অনর্গল হয়ে উঠেছে। সে বাঁকা ধারালো হাসির ফলা দিয়ে কমলের বুকখানা চিরে দিয়ে বললে, আসলে তা হলে নিজের কথা ভেবেই অনিতার জন্যে মায়া কান্না উথলে উঠেছে।

আবার হাসল পুলকেশ।

মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে কমল মুখ তুলে তার পানে তাকাতেই তার হাসি গেল থেমে। সে দৃষ্টির আকর্ষণ প্রচণ্ড। এক মুহূর্তে পুলকেশ সেদৃষ্টির কুহকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। স্ত্রীকে সে সব সময়ই কেমন ভয় করে এসেছে। তার সেই শীর্ণ ব্যক্তিত্ব তার সেই উজ্জ্বল মোহময়

দৃষ্টি তাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। সে তার চোখে চোখ রাখতে পারল না। নিস্পন্দ হয়ে মাথা নত করল।

কমল ঋলসে উঠল, দুজনের কথাই একসঙ্গে না ভেবে উপায় নেই। আমার ওপরই যে তার ভবিষ্যত নির্ভর করছে। তাকে বাঁচাতে হলে নিজেকে আগে বাঁচাতে হবে দানবের নাগপাশ থেকে। সর্বনাশ যে দুজনেরই করেছো।

তোমারও সর্বনাশ করেছি ?

অস্ফুট প্রতিবাদ করল পুলকেশ।

—বুকে হাত দিয়ে নিজের অন্তর্যামীকে জিজ্ঞেস করো জেনেশুনে আমার সর্বনাশ করেছো কিনা! লোভ ছিল না আমার ওপর! জানতে না আমি ছোটকে ভালবাসতুম, সে আমাকে ভালবাসতো। ছোটর হিংসায়, ছোটকে আঘাত করবার জন্যে তুমি আমায় বিয়ে করোনি! কর্তার কাছে নির্লজ্জের মতো মুখ ফুটে বলোনি যে ঐ-মেয়েকে ছাড়া আমি বিয়ে করবো না! জানতে না আমরা দুজনে এক রকম বাগ্‌দত্ত হয়েছিলুম! তাই নিয়ে এ-বাড়িতে কত কানাকানি হয়েছে।

খানিক চুপ করে থেকে পুলকেশ তিক্ত বিদ্রূপের কণ্ঠে প্রশ্ন করল, সেই ভালোবাসা কি এতোদিন বুকের তলায় জিইয়ে রেখেছিলে, না তাকে দেখে আবার নতুন করে জেগে উঠল।

—সে কথা জানবার দরকার তোমার নেই। এ বন্ধন থেকে আমার মুক্তি চাই। অনিতা,র জন্যে এবং আমার জন্যে এ বিবাহ বিচ্ছেদ প্রয়োজন হয়েছে। তুমি যদি নিজে থেকে এর ব্যবস্থা করো ভালোই নইলে এ ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

পুলকেশ শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার পানে তাকাল।

কমল বললে, আর আমি অনিতার সঙ্গে দেখা করে—

আতঙ্কিত স্বরে পুলকেশ বলে উঠলো, কেন, তার কাছে তোমার কি দরকার ?

খিল খিল করে সশব্দে হেসে উঠল কমল। হাসি থামিয়ে নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললে, কী দরকার? সেই তো তোমার মৃত্যুবান। সেই তো আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার বিষয়বস্তু। যতই পিরীত তোমার সঙ্গে হোক না, আমাকে মানতে সে বাধ্য। তাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার গতি নেই। হয় তাকে বিয়ে করতে হবে, নইলে মোটা টাকা খেসারত দিতে হবে। তাকে দিয়ে আমি তোমার নামে ড্যামেজের মামলা করাবো।

—এ-সব কি বলছো তুমি কমল? এ-সব মতলব তোমায় দিচ্ছে কে? ঐ ছোট রাসকেলটা বুঝি?

উন্মত্ত আক্রোশে কমল ধমক দিল, খবর্দার আমাদের ব্যাপারে ছোটকে টেনো না। সে এর বিন্দু বিসর্গ জানে না। আমি তোমার সংস্পর্শ সহ্য করতে পারছি না। আমার মনকে তুমি বিষিয়ে দিয়েছো। আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছো। অনেক দিন আমি মুখবুঁজে সহ্য করেছি এই কলঙ্কিত অঘটন। আর না। পতির অনুগমন করে আমি পতিব্রতা হতে চাইনা।. আমি বাঁচতে চাই। তোমার মুখ চেয়ে তিলে তিলে আত্মহত্যার করার চেয়ে আত্মোদঘাটন করা ঢের ভালো। আমি বাঁচতে চাই। এ বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করে আমি মুক্ত হতে চাই। আমি সত্যিকার জীবনে ফিরে যেতে চাই।

পুলকেশ অবশ, অসাড় হায় গেল। সে স্থানুর মত নির্বাক হয়ে তার পানে চেয়ে রইল।

|| নয় ||

বিপর্যয় কান্ত।

কলেজ থেকে ফিরে বিপাশা কমলের ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঘরের মেঝেয় উপুর হয়ে কমল পড়ে আছে।

দুপায় এগিয়ে গিয়ে তার আলুণ্ঠিত দেহের পানে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল। তার গতি গেল থেমে। চোখের দীপ্তি এলো ধূসর হয়ে। আর্তনাদ করার শক্তি গেল লুপ্ত হয়ে। মনে হলো সে মুর্চ্ছিত হয়ে যাবে। ঘরের নিস্তব্ধতায় যেন কতকগুলো প্রেত ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেয়ালগুলো যেন অবাস্তব শূন্যতা দিয়ে তৈরী।

সে যে কী দেখছে বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখে যা দেখছে চেতনা দিয়ে তা ধরতে পারছে না। নিজের সজ্ঞান অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে সন্দিহান। বিস্ময়ের মির্দয় আঘাতে সে মূর্চ্ছিত।

হঠাৎ তার আতঙ্কভরা বিস্মিত চোখে নামল অশ্রুর প্লাবন। সে ক্ষিপ্রপায়ে দৌড়তে দৌড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

অমলেশ যখন স্টুডিয়োতে কাজ করে তখন ভিতরে কারুর প্রবেশাধিকার নেই। মডেল থাকে নানা বেশে, নানা ভঙ্গিতে। তার বেশীর ভাগ মডেল অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান অথবা ইহুদি মেয়ে। কাজেই সে সময় কারুর ভিতরে যাবার অনুমতি ছিলনা।

বাইরের দোরে পাহারা নেপালী দারোয়ান বাহাদুর।

বিপাশা স্খলিত পায়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এসে স্টুডিয়োর দরজা থেকেই আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো, ছোটবাবু!

বাহাদুর ভিতরে খবর দিতে গেল।

অমলেশ বাইরে আসতেই বিপাশা কেঁদে উঠলো, রাঙাপিসি আত্মহত্যা করেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মত চমকে উঠলো অমলেশ : সে কি ?

ঊর্ধ্বশ্বাসে দুজনে উপরে উঠে গেল।

কমলের শোবার ঘরের সংলগ্ন ঘর। ঘরের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কমল।

দুজনে ধরাধরি করে কমলের দেহটা উলটে দিল। শক্ত কাঠ হয়ে গেছে দেহটা। চোখ দুটো বন্ধ। নিচের ঠোঁটখানা দাঁত দিয়ে শক্ত করে চাপা।

টেবিলের উপর শূন্য একটা গ্লাস আর একটা ছোট ওষুধের শিশি। শিশির ভিতর কতকগুলো সাদা টেবলেট। কমলের দুপুরের ওষুধ। বিপাশা কলেজ যাবার সময় টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

ঘরে ভিড় জমে গেল।

পুলকেশকে আপিসে ফোন করা হলো। ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হলো।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, মৃত্যু হয়েছে অন্তত দু-তিন ঘণ্টা পূর্বে। খুব সম্ভব পোটাসিয়ম সাইনাইড বিষে।

পুলকেশ বজ্রাহতের মত কমলের পানে চেয়ে অশ্রুরোধ করতে পারল না। দুহাতে মুখ ঢেকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিপাশা কমলের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পুলিশ এলো। ময়না তদন্ত হলো। বাড়ির পরিজনদের জবানবন্দী নেওয়া হলো।

বিপাশা বাড়ি ছিল না। কলেজে গিয়েছিল পুলকেশ ছিল আপিসে। অমলেশ নিচে ষ্টুডিয়োতে কাজ করছিল। কাজেই কেউ কিছুই বলতে পারল না। প্রত্যহ দুপুরের আহারের পর কমল ঐ শিশির ট্যাবলেটটা খেতো। বিপাশা কলেজ যাবার সময় ওষুধের শিশিটা আর একগ্লাস জল টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল। বিপাশা কলেজ যাবার সময়

তাকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত দেখে গিয়েছিল। সে বিনুনী করে দিয়েছিল বিপাশার ও হাসিমুখেই তাকে বিদায় দিয়েছিল।

গ্লাসের তলদেশের শ্বেতপদার্থ রাসায়নিক পরীক্ষায় পোটাসিয়ম সাইনাইড বলেই প্রমাণিত হলো। কিন্তু কেউ বলতে পারলে না কমল কোথা থেকে কেমন করে পোটাসিয়ম সাইনাইড বিষ সংগ্রহ করল।

শীতের অবসন্ন বেলার মত বাড়ির মাঝে ঘনিয়ে এলো শোকের অশরীরী কালো ছায়া। অকূল স্তব্ধতা। সবাই যেন ভয়ে জড়সড়। সকলেই স্তিমিত, মুহ্যমান। মুখে কারুর কোন কথা নেই, চোখে আতঙ্ক দেহে জড়তা। ধিকিয়ে ধিকিয়ে কোন রকমে চলাফেরা করে। বাড়ির গায়ে যেন মৃত্যুর করাল স্পর্শ লেগে আছে। বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

পুলকেশ কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে না। ঘরের নিরিবিলি অন্ধকারে একা হতচেতনের মত বসে থাকে। কেউ সাহস করে তার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, কাছে যেতে পারে না। বিপাশা কাছে গেলেই তার চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তাই সে দূর থেকে দেখে সরে আসে।

আর বিপাশা! বিধাতা তাকে তার আশ্রয়নীড় থেকে নির্মম হাতে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছে। যে বাড়ির প্রাণময় পরিবেশের মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে, সে বাড়ি তার কাছে এখন ভয়াবহ বিভীষিকা। দীর্ঘদিন পরে সে আত্মীয়-স্বজন আপনজনের অভাব অনুভব করল। তার মনে হলো সে জন্ম-একা। কমলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ সংসারের সঙ্গে তার সকল সম্বন্ধ নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ বাড়ির উপর তার কোন মায়া নেই, এ সংসারে থাকবার তার কোন অধিকার নেই।

বিপাশার মন যেন অসাড়। তার ভাববার শক্তি পর্যন্ত গেছে লুপ্ত হয়ে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারেনা যে তার রাঙাপিসি বেঁচে নেই।

করোনারের তদন্তে কমলের আত্মহত্যাই সাব্যস্ত হলো। কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না কারুর মনে।

নিঃসংশয় হতে পারল না শুধু অমলেশ। কমলের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু শুধু তাকে ব্যথিত করেনি, তাকে রীতিমত বিচলিত করে তুলেছে। কৈশোর ও যৌবনের সমস্ত আবেগ দিয়ে সে তাকে ভালবেসেছিল। অভিনিবেশ সহকারে সে তাকে অধ্যয়ন করেছিল। বাল্যকাল থেকেই সে দৃঢ়চিত্ত। অসাধারণ তার মনোবল। অমলেশ তাকে মুখস্থ করে ফেলেছিল। তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কমলের এই আত্মঘাতী মনোবৃত্তিকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। এ-যেন কমলের মত নয়। তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। সে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। সে ধোঁয়ার গন্ধ পায়। অথচ কোন সূত্র খুঁজে পায় না। সে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করে। তার মনে হয় নহুষের প্রেতাত্মার মত, হ্যামলেটের পিতার মত একদিন কমলের অশরীরী আত্মা আবির্ভূত হয়ে রহস্য উদঘাটন করে দেবে। সন্দেহের এই বিষাক্ত ধোঁয়া তার দম বন্ধ করে দেয়। সে হাঁপিয়ে ওঠে।

দৈবাৎ তার বিপাশাকে মনে পড়ে। ক-দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তার কোন খবর রাখেনি। মনে মনে লজ্জিত হলো অমলেশ। এই অভাগিনী মেয়েটিকে কমল কী ভালোই বাসতো। তার অভাবে এই শূণ্য পুরীর মাঝে বিপাশা যে মনে মনে কত একা আর অসহায় মনে ভেবে অমলেশ তার জন্য উদ্বেগাকুল হয়ে উঠল। সে বিপাশার ঘরের বাইরে থেকে তাকে ডাক দিল।

বিপাশা শুয়েছিল।

চমকে উঠে বসে বসে বলল, আসুন।

অমলেশ তার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে বসল। এই কটি দিনে মেয়েটা কী বদলেই গেছে! তার মনের অপার শূন্যতা তার সমস্ত শরীরে, তার মুখের প্রতিটি রেখায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ ভাটার চড়ায় এসে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। দুর্যোগের রাত্রি পার হয়ে ভোরের নিষ্প্রভ শুকতারা যেন অবসন্ন ধরিত্রীর পানে চেয়ে দেখছে। চঞ্চল বালিকাকে তার নিষ্ঠুর নিয়তি যেন এই কটি দিনে পরিণত নারীত্বে পৌঁছে দিয়েছে।

—শরীর অসুস্থ নয়তো ?

প্রশ্ন করল অমলেশ।

বিপাশার হৃৎপিণ্ড মুচড়ে উঠল অমলেশের এই উদ্বেগভরা সস্নেহ কুশল প্রশ্নে। বাষ্পের জোয়ারে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তার চোখ দুটি অশ্রু-ব্যাকুল হয়ে উঠল। চোখ তুলে তার মুখের পানে তাকাতে গিয়ে সে নিজেকে সামলাতে পারল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে কেঁদে উঠল। অমলেশ কথা বললে না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে বসে রইল। আজ সে প্রত্যক্ষ করল, বিপাশা কত অসহায়। কত একা। পিতৃ-মাতৃহারা অনাথা বালিকা জ্ঞান হবার পর থেকেই কমলের স্নেহ-আবেষ্টনে প্রতিপালিত। তাকে ঘিরেই ওর জীবন গড়ে উঠেছে। তাকে হারিয়ে, তাকে বাদ দিয়ে ও নিজের অস্তিত্বকে কল্পনা করে কেমন করে ?

মনের গভীরে অমলেশ বিপাশার জন্য একটা তীব্র বেদনা অনুভব করল। সে চুপ করে বসে রইল, একটি কথাও বললে না। বিপাশা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

চোখের জল ফুরিয়ে গেলে বিপাশা যখন মুখ তুলে তার পানে তাকাল, অমলেশ হঠাৎ প্রশ্ন করলে, নিজের সম্বন্ধে কিছু ঠিক করলে বিপাশা ?

বিপাশার মুখে অগাধ অসহায়তা। কালো বড় বড় চোখ দুটিতে অপার শূন্যতা। সে যে কী বলবে ভেবে পেলে না।

—বড়বাবু কিছু বলেছে ?

প্রশ্ন করল অমলেশ।

—না।

বিপাশা ঘাড় নাড়ল।

অমলেশ এই শোকাকুল স্তব্ধতা ভাঙবার জন্য প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জিজ্ঞেস করল, সেই সুন্দরী মেয়েটি, কী যে নাম, অনিতা—বাড়িতে আসছেন কি ?

বিপাশার বিশুষ্ক অধরে ফুটে উঠল, শীর্ণ হাসির আভাস। ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, জানি না। তবে সে আসবার আগেই আমি এখান থেকে যেতে চাই। আমাকে কোন একটা কাজে ভর্তি করে দিতে পারেন?

অমলেশ হাসল। বললে, কেন, তিনি তো তোমার গানের টিচার। এলে তো ভালোই হবে। রূপের জলুষে, মিঠে গলার গানের সুরে বাড়ি আবার ঝলমলিয়ে উঠবে। তোমার পিসেবাবুর জীবনে নতুন ফুল ফুটবে।

বিপাশা মুখ নামিয়ে বললে, আপনার ভাই, নতুন বউদি। আমার কি? আমার এখানকার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিনই অনিতা আমায় বলেছিল, গিন্নীর কুকুর তাই কর্তা ভালবাসে, নইলে এ বাড়ির কেউ নও। আজ মনে হচ্ছে কথাটা খাঁটি সত্যি।

বিপাশার চোখদুটি আবার ছলছলিয়ে এলো।

অমলেশ হঠাৎ তার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, চিয়ার আপ মাই গার্ল। কান্নার চেয়ে সংসারে অনেক মহৎ কাজ আছে। যাও, মুখ চোখ ধুয়ে আমার স্টুডিয়োতে নেমে এসো। বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় খানিক ঘুরে আসবে চলো।

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গাড়ি রেখে প্যারেড গ্রাউণ্ডের একপাশে নিরিবিলিতে দুজনে বসল।

অমলেশ আর বিপাশা।

সামনে একখানা রুমালে চিনাবাদাম। অমলেশ বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বিপাশাকে বললে, ক্যারি অন্।

বাদাম চিবোতে চিবোতে অমলেশ হঠাৎ গাঢ় গম্ভীর গলায় বিপাশাকে জিজ্ঞেস করলে, কমল কেন আত্মহত্যা করবে বলতে পারো?

বিপাশা অবাক হয়ে অমলেশের পরিপুষ্ট কঠিন মুখের পানে তাকাল। সে বুঝে উঠল না অমলেশ কী বলতে চায়? তার কাছে কী সে জানতে চায়?

অমলেশ বললে, তোমার চেয়ে কেউ বোধ হয় তার প্রিয় ছিল না। তুমিও তাকে ভালোবাসতে। তার মনের কোন কথাই তোমার অজানা ছিল না। তুমি ছিলে তার কীপার অব কনসেন্স। তোমার মন কি বলে? কমল আত্মহত্যা করেছে?

—তবে? আপনি কি বলেন?

—আমি যতোটুকো তাকে জানি বা জানতুম তাতে আমার মন বলে সে আত্মহত্যা করেনি। তার মতো মেয়ে আত্মঘাতী হয় না।

শেষের দিকে অমলেশের গলার স্বরটা বেশ জোরালো। শুধু জোরালো নয়, ঝকঝকে তরবারির মত ধারালো।

—তবে? তবে?

—আমি জানি না। তাই তোমার কাছে জানতে চাই। তোমার মনে কোন সংশয়ের ছায়া আছে কি না?

মাথা নিচু করে বিপাশা বললে, কিন্তু সংশয় তো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে না।

হঠাৎ মুখ তুলে অমলেশের চোখে চোখ রেখে বললে, আত্মহত্যা ছাড়া আর কিবা হতে পারে?

—হত্যা?

—হত্যা? হত্যা করবে কে? কেন করবে? হাত দুটি কোলের ওপর জড়ো করে ধ্যানাবিষ্টের মত তার পানে চেয়ে রইলো।

অমলেশ বললে, আমরা জানি না কে করবে, এবং কেন করবে। সবটাই আমাদের কাছে সংশয় ও রহস্যে ঢাকা।

বিপাশা বললে, পোটাসিয়ম সাইনাইডের মত তীব্র বিষ রাঙাপিসি পেল কোথা থেকে তার কোন তদারক হলো না।

—সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্যাপার—কোন ফাউল প্লে-র সন্দেহ নেই কাজেই পুলিশ ব্যাপারটা ঘাঁটাঘাটি না করে তাড়াতাড়ি যবনিকা ফেলে দিল। আমরাও তাদের হাতে হাত মেলালুম।

বিপাশা ভাবচে। তার মন জগতের ওপারে। অমলেশ অপলকে তার মুখপানে চেয়ে আছে।

দৈবাৎ বিপাশার একখানা হাত চেপে ধরে অমলেশ বললে, সন্দেহের এই কালো ধোঁয়া আমার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না বিপাশা। তার অশরীরী আত্মা কম্পিত দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আমার চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না।

বিপাশা শিউরে উঠল।

অমলেশের চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন। বেদনা বিধুর অসহায় চোখে বিপাশা তার পানে তাকাল। রাঙাপিসি একা তারই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে যায়নি, এই লোকটিরও আনন্দময় জীবনে ভরে দিয়ে গেছে রিক্ততার হাহাকার। কমলকে ভালোবাসতো অমলেশ; কিন্তু তাকে সে যে কত ভালোবাসতো আজ সে প্রথম উপলব্ধি করল। এদের প্রণয়ের ব্যর্থতাই এই শোচনীয় পরিণতিতে পর্যবসিত হলো।

দিনের আলো নিভে আসছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের কোলে রক্তের ঢেউ লেগেছে। দূর দিগন্তে ধূসর আকাশ কোলে একটি তারা জ্বলছে। তারাটার পানে চেয়ে চেয়ে বিপাশার মনে হয় রাঙাপিসি তাদের চেয়ে দেখছে। কমল যেন ওর চেতনাকে আশ্রয় করে আকাশে বাতাসে, অবারিত মাঠের বুকে ছড়িয়ে রয়েছে। বায়ুস্তরে সে শুনতে পায় কমলের চাপা হাসির শব্দ। নাকে ভেসে আসে কমলের গায়ের মিষ্টি গন্ধ। বিপাশা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নিমেষহারা চোখে আকাশের পানে চেয়ে দেখে।

অমলেশের স্পর্শের ডাকে বিপাশা সজাগ হয়ে তার মুখপানে তাকাল। অমলেশ বললে, আমার মনের কথা তোমাকে জানিয়ে রাখলুম। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা এখন চলবে না। তাহলে প্রতিপক্ষকে সাবধান ও সতর্ক হবার সুযোগ দেওয়া হবে। তাতে ফল দাঁড়াবে উলটো। সময়ের হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমাদের অপেক্ষা

করতে হবে। অন্ধকার চিরদিন থাকবে না। সত্যের শুভ্র আলোয় একদিন অন্ধকার গলে যাবে। অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্য। আমরা সেইদিনের প্রতীক্ষা করবো বিপাশা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিপাশা তার মুখপানে তাকাল।

অমলেশ বললে, তোমাকে এখন দিনকতক দুঃখকষ্ট স্বীকার করেও ঐখানে থাকতে হবে বিপাশা।

—কেন গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে?

—দরকার হলে আমাকে সাহায্য করবার জন্য।

—আপনি কি গোয়েন্দা নাকি?

মৃদু হাসল অমলেশ। বললে, গোয়েন্দা নই। তবে গোয়েন্দার চেয়ে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ আমার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দিয়ে মানুষের গভীর অন্তর দেখে নিয়ে তারপর রঙ আর তুলি দিয়ে সেই ভাব ফুটিয়ে তুলি মুখে।

বিপাশার পরিম্লান অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

॥ দশ ॥

মানুষের মনের মধ্যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির একটা করে কেন্দ্র আছে। ব্যাটারির শেলের মত পৃথক পৃথক ভাগ করা। নিজের নিজের কোষের মধ্যে প্রবৃত্তিগুলো সচরাচর চলাফেরা করে। কোন এক বিশেষ প্রবৃত্তি যখন উদ্দাম হয়ে ওঠে, তখনি জীবনের স্বাভাবিক বহ্নি যায় নিভে। তার তাড়নায় মানবিক চেতনা ওঠে সঙ্কুচিত হয়ে। অথচ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

এমনি একটা জোরালো প্রবৃত্তির পুচ্ছ তাড়নায় অনিতা অকস্মাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানুষের দেহমন আদিম ধাতু নিয়ে গড়া। সেই দেহের প্রতিটি তন্তু দিয়ে সে জীবনকে উপলব্ধি করতে চায়। উপভোগ করতে চায়। পৃথিবীর আলোবাতাস আর সূর্যের তাপ তার স্নায়ু শিরায় অনুপ্রবেশ করে তার রক্তের মাঝে কামনার ঝড় তোলে। তার গভীর অন্তরে কি যেন উন্মুক্ত ও বিকশিত হয়ে এক অভিনব রসের আস্বাদে তাকে ব্যাকুল করে তোলে। স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রচণ্ড শক্তির কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া তখন আর উপায় থাকে না।

অনিতার জীবনের এ-দিকটা ছিল তার অনুভূতির অগোচর। জীবনে তার পুরুষ বন্ধু ছিল না। এ-দিকের দরজা জানালা বন্ধ করেই সে এতদিন কাটিয়েছে। হঠাৎ পুলকেশ দু-হাত দিয়ে সবলে বন্ধ দরজা জানালাগুলো হাট করে খুলে দিল। খোলা জানালা দিয়ে কামনাময় পৃথিবীর রূপ দেখে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সেদিকের আলোয় অলৌকিক দীপ্তির ছোঁয়াচ। বাতাসে মাতাল করা সুগন্ধ। নতুন অভিজ্ঞতার রঙিন নেশায় দিকভ্রান্ত হয়ে সে পুলকেশের পিছু পিছু ছুটল। তনু-ভোগের পিপাসায় কণ্ঠাগত হয়ে উঠল। সবল, ক্ষুধিত শরীরে পেল ক্ষণভোগ্য আরামের আস্বাদন।...

কমলের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে অনিতার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সে নিজেকে খাড়া রাখতে পারল না। তার স্বপ্নের পৃথিবী ওলোট পালট হয়ে গেল। ভিতরটা একটা প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

বউরাণি আত্মহত্যা করেছে। এই সত্যটা তার মনের মাঝে অভ্রভেদী হয়ে, আশপাশের সব কিছু অন্ধকারে ডুবিয়ে গেল।

বউরাণি,—হাস্যময়ী ভাগ্যবতী মেয়েটিকে সে প্রথম থেকেই ভালবেসেছিল। তারি অনুকম্পায় সে সংসারের এক কোনে বাসা বেঁধে স্থিতি হয়েছিল। সেই মেয়েটিকে সে তার স্বামীর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিল। নিজের লোভের জন্য, ক্ষণিকের তৃপ্তির জন্য সে তার স্বামীকে কেড়ে নিল। অনিতার মনে হলো সেই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। সেই তাকে হত্যা করেছে। তার অপমৃত্যুর জন্য সেই একা দায়ী। ভয়ে ও লজ্জায় তার ভিতরটা অবশ ও পাথর হয়ে গেল।

বউরাণি হাসছে। তার চোখের সামনে কমলের ছায়ামূর্ত্তি ভেসে ওঠে। অপরূপ, উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ, পাতলা ভিজে ভিজে দুখানি ঠোঁট; শুভ্র সুকোমল দুখানি হাত, পিঠের বক্ররেখা। অনিতা ভয়ে চোখ বোঁজে। চোখ বুঁজে মাথা নত করে মনে মনে সে স্বীকার করে, আমি—আমিই দায়ী। আমার জন্যই এই সুখের স্বর্গ থেকে তোমাকে বিদায় নিতে হলো।

অনিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অন্ধকারে উপুর হয়ে খুব খানিক কাঁদল।

রাতের এই সময়টি তার পুলকেশের জন্য চিহ্নিত। তার কথা মনে হতেই সমস্ত দেহমন জুড়ে একটা বিসর্পিল বহ্নিশিখা খেলে গেল।

আসক্তি আর ঘৃণা মনের অতলে পাশাপাশি বাস করে। কেমন করে নিজের অজ্ঞাতে আসক্তি অবজ্ঞায় ও অশ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয় বোঝা শক্ত। অনিতার অন্ধ মোহ হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে গেল অপরিসীম ঘৃণায়। পুলকেশ তাকে কলঙ্কিত করেছে। তার পতনের জন্য দায়ী ঐ লোকটি। পুলকেশ।

তারা দুজনেই মাটির কলঙ্ক। দুয়ে মিলে একটি সাজানো সংসারকে উৎখাত করে দিল। তাদের কুৎসিৎ কামনার আগুনে পুড়ে মলো একটি ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়ে। পুলকেশের চিন্তা পর্যন্ত তার কাছে কদর্য ও অশ্লীল মনে হলো। সে হিংস্র নির্মম দৃষ্টিতে অন্ধকারের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। যেন পুলকেশের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

স্তব্ধতার অন্ধকারে রাত্রি গভীর হয়ে উঠল। অনিতার চোখে ঘুমের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তার দুই চোখে জ্বলছে অন্ধকারের অনির্বাণ শিখার মত প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর উলঙ্গতা। নিদারুণ উদ্বেগ ও অস্বস্তিতে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল। একা আছে এইটুকুই তার তৃপ্তি। পরিচিত মানুষের সংস্পর্শ আর সে কিছুতেই সইতে পারবে না। পরিচিত জীবনের ক্ষেত্র তার ভূমিকম্পে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। নিজেকে তার অত্যন্ত অসুস্থ মনে হলো।

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে সে বিস্মৃত অতীতের পানে ফিরে তাকাল। জীবন ছিল তার কত শুভ্র। শরীর ছিল তার নিস্তরঙ্গ। নিষ্কলঙ্ক। চরিত্র ছিল তার কত উজ্জ্বল, কত পবিত্র। পড়াশুনো আর দুঃখ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে কখন যে দেহে যৌবন এলো সে জানতেও পারলে না। যৌবনের উপলব্ধিতে সে ছিল উদাস। অশরীরী। নিজের দিকে তাকাবার তার সময় ছিল না। মন তাই বাড়তে পেল না। মনে রঙ ধরল না। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত করে নিজেকে গড়ে তুলল গভীর নিষ্ঠায়। লেখাপড়া শিখল। গান শিখল। চিরদিনই সে লাজুক আর শান্ত। রূপ থাকলেও, পুরুষের মন ভোলাবার বা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াসকে ঘৃণা করেছে সে চিরদিন। তার শরীর সম্ভারকে সে আবৃত করে রাখতো একটা নিষ্ঠুর কাঠিন্যে। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। সত্যই সে শক্ত মেয়ে। তবু সে পথ ভুল করল। উদ্দাম যৌবনকে অভিনন্দিত করবার লোভে সে উদভ্রান্তের মত আলেয়ার পেছনে ছুটল। পরের ঐশ্বর্য চুরি করে সে নিজের সৌভাগ্য সৌধ গড়তে চাইল।

অনিতার ভয় করতে লাগল। মনে হলো তার নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে ময়াল সাপের মত আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তার নিষ্ক্রমণের পথ নেই। কাল সকালে যদি কেউ এসে কিছু জিজ্ঞেস করে সে বলবে কী? মানুষের পানে সে মুখ তুলে চাইবে কেমন করে?

হঠাৎ মনে পড়ল, পুলিশ আসতেও পারে, বউরাণির আত্মহত্যার তদন্ত করতে। পুলকেশের সঙ্গে তার নির্লজ্জ ঘনিষ্ঠতার কথা কারুর অজানা নেই। তার মনে পড়ল, অমলেশকে। তার সর্বশরীর কেঁপে উঠল। লজ্জায় ও অপমানের ভয়ে তার নাড়িতে মোচড় দিতে লাগল।

না। এখানে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না। এখান থেকে তাকে যেতেই হবে। মরতে হয় মরবে, তবু সে এ জঘন্য কলঙ্কের বোঝা নিয়ে কারুর কাছে এ কলুষিত ইতিহাস আবৃত্তি করতে পারবে না।

....কিন্তু এ রাত্রির কি শেষ নেই? দিনের আলো কি ফুটবে না?

রাত্রির অন্ধকার ফিকে হতেই সে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশের প্রান্তে তখনো একটা তারা মিট মিট করে জ্বলছে।

স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মত অনিতা গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে হাতে একটা স্যুটকেশ নিয়ে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে এসে দাঁড়াল।

সময়ের চাকা ঘুরছে। বিকল ব্রেক-ডাউন গাড়ির মত বিধ্বস্ত সংসারটাকে চেনে বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সময়। বিপাশা তার স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে সময়ের গতির মুখে গা-ভাসান দিয়ে। গৌরীসেনের তহবিল খোলা আছে। টাল খেতে খেতেও সংসার গড়িয়ে চলেছে। সকালে সরকার একবার তদ্বির করে যায় বাজারের ফর্দে বিপাশার কোন বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা। আর ভাঁড়ারী এসে রান্নার আয়োজনের দফার একটা মামুলী বিবরণী পেশ করে যায়।

বিপাশা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

পুলকেশ প্রায়ই বাইরে থাকে। কখনো কয়লাখনিতে, কখনো অন্য কোথাও। বিপাশার সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। কোথায় থাকে কোথায় যায় তার কোন উদ্দেশ পায়না। বিপাশার মনের অতলে একটা কালো সংশয় মাঝে মাঝে ছায়াপাত করে। অনিতা যে পুলকেশের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, সে-কথা সে বিশ্বাস করে না। তার মনের দৃঢ় বিশ্বাস অনিতা এখানেই কোথাও গোপনে বাসা বেঁধেছে এবং পুলকেশ সেইখানেই রাত্রি যাপন করে।

অমলেশের ও সেই ধারনা।

পুলকেশ এখানে থাকলে, বিপাশার মনে যা-ই থাক, বাইরে সে তার সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে সব সময়ই সচেতন। কমলের ঘরখানি ঠিক আগের মত সাজিয়ে রাখা, নিজের ঘর গোছানো এমনি টুকিটাকি কাজ শেষ করে অমলেশের ঘরের দিকে যায়।

এমনি ভাবেই তিন মাস কেটে গেল

রুদ্র আকাশ মেঘমেদুর হয়ে উঠল। রুক্ষ মাটি সবুজের কোমলতায় ভরে গেল। সবুজের শ্যাম শোভায় প্রকৃতি রহস্য নিবিড় হয়ে উঠল। দূর দিগন্ত ধূসর মেঘের কোলে শ্যামরেখা টেনে দিল।

অবারিত আকাশের নিচে একা একা গাড়ি বারান্দায় বসে বিপাশা লীলাচঞ্চল মেঘের পানে চেয়ে দেখে। মন তার বর্ষাসজল প্রকৃতির মতই দাক্ষিণ্যের ঘন হয়ে- ওঠে। প্রকৃতির গাঢ় সবুজের আভা লাগে তার অন্তরে বাইরে। তার অনুভবের আকাশে নতুন মেঘ জমে।

রাত্রে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি নামে। মেঘঘন ধূসর আকাশে যেন ক্রমশ নিচে নেমে আসে। আকাশে চাঁদ ওঠে না। তারা জ্বলে না। বিপাশার চোখে ঘুম আসে না। অকারনে মনটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। একা ঘরে তার কেমন ভয় করে। দাসদাসি পূর্বের মতই নিচে থাকে।

অমলেশ একখানা ছবি আঁকা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। উত্তরপ্রদেশের এক রাজার জন্যে ছবিখানা আঁকা হচ্ছে। সর্বক্ষণ সে স্টুডিয়োর

ভিতর। নির্দিষ্ট সময়ে উপরে ওঠে স্নানাহার করতে। সেই সময়টিতে তার বিপাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অমলেশের যা কিছু প্রয়োজন এই ক-টি দিনে সে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করে নিয়েছে। কবে, কেমন করে অমলেশের এই আবশ্যকীয় ছোটখাটো কাজগুলির ভার বিপাশার অন্তরের গভীরে আটকা পড়ল সে নিজেই জানে না। অবশ্য কর্তব্য ভেবেই সে এ-ঘরের কাজ করে। এ-ঘরের কাজ করতে করতে বিপাশার মনের আকাশ আলো হয়ে ওঠে। তার মনে যে আলো জ্বলে, সে-টা অনেকটা মন্দিরের দেবদাসীর মনের আলো। সে আলো কেউ জ্বালায় না, আপনি জ্বলে। কেউ তাকে কোন দিন এ-কাজের ভার দেয়নি। তার আমোদ লাগে তাই করে। করে তৃপ্তি পায় মনে, তাই করে।

বিপাশা কিন্তু যার সেবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে তার মনের নাগাল পায় না। অমলেশের শিল্পীমন আসল মানুষটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। বিপাশার পানে এমনি দৃষ্টি দিয়ে তাকায় যে বিপাশার মনে হয় বুঝি ওর বোধশক্তি নেই। কী দেখছে, কাকে দেখছে সে নিজেই বুঝতে পারে না। কী খাচ্ছে তাও যেন সে জানে না। বিপাশা তার খাবার সময় নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে বসে। অমলেশ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে ভেজাতে তারপানে চেয়ে হাসে। কালো রেশমের মত গুচ্ছচুলগুলো বাঁ হাতে পেছন পানে ঠেলে দিতে দিতে তার চোখের দৃষ্টি রহস্যময় হয়ে ওঠে। তার ধারাল মুখে কালো পল্লবে ঢাকা বড় বড় চোখদুটিকে বিপাশার ভারী সুন্দর মনে হয়।

ছবির নেশায় অমলেশ বিভোর। সমস্ত সত্তা হারিয়ে সে শুধু ছবির কথাই ভাবে। বিপাশার মনে হয় অমলেশ কমলের শোক ভুলেছে ছবির চিন্তায় ডুবে।

অমলেশ বিপাশাকে বলে, আমার এ ছবির নাম কি জানো বিপাশা?

—কী?

—হলদে দুপুর। দুপুরকে রূপায়িত করে তুলবো ঐ মডেল মেয়েটির মধ্যে দিয়ে।

বিপাশা নিঃশব্দে তার পানে চেয়ে থাকে।

অমলেশ বলে, দেখেছো তুমি আমার মডেল ডায়নাকে? দেখেছো ওর অঙ্গসৌষ্ঠব, দেখেছো ওর দেহের নিখুঁত গঠন, দেখেছো ওর শ্রান্তিভরা ঘুমকাতর চোখের দৃষ্টি? আদোজাগ্রত তন্দ্রার আবেশ ওরসর্বাঙ্গে। ও মূর্তিমতী অলস দুপুর।

বিপাশা জিজ্ঞেস করে, হলদে কেন?

উৎসাহের আবেগভরা কণ্ঠে অমলেশ বলে, দুপুরের রঙ হলো হলদে। একটা উপত্যকা। হলুদ রঙা আলোর বন্যায় উপত্যকার গাছগুলো ভেসে যাচ্ছে। ঝাউ বনের শিরদেশ হলদে আভায় সমুজ্জ্বল। হলুদ রঙা শস্যক্ষেত, গোচারণের মাঠ। গরুর পাল গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। সেই আলো ছায়ার মায়ারাজ্যে গভীর আরামে গা ঢেলে দিয়েছে, দুপুরের প্রতীক ঐ ডায়না। এই হলো আমার ছবির পরিকল্পনা।

বিপাশা স্তব্ধ হয়ে ওর ভাবঘন মুখের পানে চেয়ে থাকে। অমলেশ আনমনা হয়ে যায়। তার চোখে স্বপ্নের ঘোর। বিপাশা চেয়ে চেয়ে দেখে। ওর প্রতিভা দীপ্ত কালো চোখের নিচে শ্রান্তির নীল রেখা। ওর মুখে তপস্বীর নির্লিপ্ততা। ও যেন স্বতন্ত্র। ও যেন বহুদূরে। ওর নাগাল পাওয়া দুরূহ।

বিপাশা বলে, তোমার হলদে দুপুরকে আমায় দেখাবে না?

অমলেশ বলে, নিশ্চয় দেখাব। আঁকা শেষ হোক। তুমি কেন জগতের সবাই দেখবে।

বিপাশা হাসতে হাসতে বলে, সে তো ছবি। তোমার জীবন্ত দুপুর, ঐ ডায়নাকে দেখাবে না?

—ওঃ! তাই বলো।

অমলেশ সহজ হয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, আচ্ছা, কাল আলাপ করিয়ে দোব। অনেক খুঁজে মেয়েটাকে বের করেছি আর অনেক টাকা দিতে হচ্ছে।

অমলেশ বিপাশাকে বললে, কন্টিনেণ্টাল হোটেলে লীলা এসেছে তার স্বামীর সঙ্গে।

—স্বামীর সঙ্গে ?

বিপাশা অপাঙ্গে তার দিকে তাকাল।

—তুমি জানোনা বুঝি ? লীলা যে বিয়ে করেছে। কমলকে বলেছিলুম।

—সত্যি ?

বিস্ময়াকুল চোখদুটি কপালে তুলে তার দিকে ফিরে তাকাল।

—তামাসা করছি ? কমলের মৃত্যুর ক-দিন আগে সে বিয়ে করেছে দাক্ষিণাত্যের এক ফিল্ম প্রোডিউসারকে। অগাধ ধনী।

—লীলার বিয়ে হয়েছে ? চোখের মাঝে রাজ্যের বিস্ময় জড়ো করে অধিকতর বিস্ময়ের কণ্ঠে বিপাশা জিজ্ঞেস করলে, সত্যি বলুন না, লীলা বিয়ে করেছে ?

তার ছেলেমানুষী ঔৎসুক্য দেখে হেসে ফেলল অমলেশ। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, সত্যি। সত্যি। এই তিন সত্যি। লীলা বিয়ে করেছে। রীতিমত বিয়ে। পুরুষের সঙ্গে।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বিপাশা বললে, আমি জানতুম না কিনা—

—জানতে না, জানলে। তাই নিয়ে এমন পাগলামি করবার কি আছে ?

বিপাশা অপরাধীর মত ডাগর কালো চোখ দুটি তুলে বিনীত কোমল সুরে বললে, সচরাচর এমন তো ঘটে না, তাই—

তার মুখের ভাবে, তার চোখের আর্দ্র দৃষ্টিতে, তার কথা বলার কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে অমলেশের মনে মায়া জাগল। সে আস্তে আস্তে তার একখানি হাত ধরে অত্যন্ত কোমল সুরে বললে, এই স্বাভাবিক বিপাশা। সংসারে সচরাচর এমনি ঘটে।

মুখ না তুলেই দ্বিধাজড়িত স্বরে বিপাশা বললে, কিন্তু সে যে আপনাকে ভালোবাসতো।

অমলেশের এ-কথা বুঝতে বাকি ছিলনা যে এই প্রশ্নটাই বিপাশার মনের গভীরে তোলপাড় করছিল। সে বিপাশার দিকে ঝুঁকে কুটিল আহত স্বরে বললে, সে-টা আমার দুর্ভাগ্য বিপাশা, আমাকে যে ভালোবাসে, সেই আমার হাত ফসকে মাটিতে পড়ে যায়।

এমনি ভাবলেশহীন বিবর্ণ মুখে বিপাশা তার দিকে তাকাল যে অমলেশের মনে হলো সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

অমলেশ কণ্ঠে অদ্ভুত কোমলতা এনে বিপাশাকে আদর করে বললে, ও-সব নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়োনা বিপাশা। আরো কিছুদিন না গেলে ঠিক বুঝতে পারবে না। আজ বিকেলে ঠিক হয়ে থেকো। দুজনে লীলার কাছে যাবো। সে বিশেষ করে তোমার কথা বলেছে।

লীলার স্বামী আনন্দরাম লোকটি চমৎকার। নাম আনন্দরাম। আনন্দের প্রতিমূর্তি। যেমন সুশ্রী তেমনি সুরসিক। ব্যবহারটি অতি মাত্রায় ভদ্র ও মিষ্টি। অধরে হাসিটি সর্বক্ষণ ভাসছে। ধূসর কালো চোখে কৌতুকের আভাস। যখন হাসে তখনি ওকে সহজ মনে হয়। ভদ্রলোক আলাপ জমাতে ওস্তাদ। বিপাশার মনে হলো অমলেশ ওর সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত।

বিপাশার চোখে লীলা বিস্ময়। সে যেন তাকে নতুন চোখে দেখল। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে সে কেবলই আনমনা হয়ে পড়ে। লীলার মুখের পানে চেয়ে সে যে কীভাবে সেই জানে। আগে থেকেই লীলা সম্বন্ধে তার মনে একটা প্রচণ্ড কৌতুহল ছিল। সেই কৌতুহলটা মনের মাঝে দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। তার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে এই সৌন্দর্যময়ী বিদুষী মেয়েটীর ভিতর আসল খাঁটি জিনিষ আছে। তাই সে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে ওর মনের গহনে কোথাও নিরাশার কালো ছায়া আছে কিনা। ও ভুল করলে না তো? বিপাশার মনে হয়, অমলেশকে ভুল করে ভালবাসলেও তাকে ভোলা শক্ত। কিন্তু লীলার মুখের জ্যোতির্ময় প্রসন্নতা কালো

দীর্ঘ পল্লবে ঢাকা চোখের দৃষ্টির স্নিগ্ধতা, তার স্ফুরিত অধরের মধুর হাসি জীবনের পূর্ণতারই পরিচায়ক। বিপাশা এর কোন মানে খুঁজে পায় না। এ কোন দেশী ভালবাসা? কেমনতর তার চেহারা?

লীলা ফুটন্ত গোলাপের মত বেশ সহজভাবেই অমলেশের সঙ্গে আলাপ করে। কোথাও একটু দ্বিধা নেই কুণ্ঠা নেই। বিপাশার মনে হয় ওর অতীতের জীবন ছিল মিথ্যায় গড়া। বিবাহের এই পবিত্র বন্ধন তাকে মুক্তি দিয়েছে সেই মিথ্যার হাত থেকে। সত্যকে করেছে প্রতিষ্ঠা। লীলা তার মগজে পাক খেতে থাকে। লীলাকে তার ভাল লাগে ভারতীয় নারীর এই বধূবেশ তাকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে। তার শুভ্র অঙ্গের রেখায় রেখায়. মাধুর্যের হিল্লোল। দেখে আশ মেটে না বিপাশার।

অমলেশ লীলার মুখপানে চেয়ে আনন্দরামকে বললে. এর তুলনা নেই। আমাদের দেশের এই বধূবেশ। এর মাধুর্য মনকে আবেশ-বিহ্বল করে তোলে। সমস্ত দেহের লালিত্যকে বেষ্টন করে এই যে শাড়ির বেড়, আর আঁচলের একটি প্রান্ত মাথা থেকে নেমে আসে মুখখানিকে ঘিরে, এর বৈশিষ্ট্য আছে। এ হচ্ছে ভাবঘন ভারতের রসের রূপ। এরি মাঝে লুকিয়ে আছে ভারতের সৌন্দর্য সাধনার উৎকর্ষ। ভারতবাসীর সহজ ও স্বচ্ছন্দ মনের সুকোমল অনুভূতি।

আনন্দরাম হাসতে হাসতে বললে, আর্টিষ্ট মাত্রই কবি। কবির ভাবাবেগ আমার কাছে অজানা জগৎ।

বিপাশা ও লীলার মিলিত হাসি বিচ্ছুরিত জলতঙ্গের মত ঘরের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল।

—সত্যিই লীলা, আজ তোমাকে আমি নতুন করে দেখছি। তোমার এ রূপ-সজ্জা তোমাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। আমাদের দেশের মেয়ে এই সাজ ছাড়া মানায় না।

লীলাদের আগমনে এবং তাদের সাহচর্যে বিপাশার শোকমলিন অবচেতন মনে লুপ্তশান্তি ফিরে এলো। তার মনটা আলোবাতাসের

মত কোমল ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কমলের আকস্মিক মৃত্যু তার জীবন যাত্রার পথকে দিশাহীন অন্ধকারে আবৃত করে দিয়েছিল। নিঃসঙ্গ জীবন তার দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। এবাড়ি থেকে তার সব অধিকার সব দাবি উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু লীলাদের হোটেল থেকে সে-দিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে মনটা তার অকারণে পুলকিত হয়ে উঠল। তার মনে হলো কমলের মৃত্যুর সঙ্গে তার মনটা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। এমন কেউ ছিল না, যার কাছে সে তার একান্ত নিঃসঙ্গ মনের নির্জনতা ঘোচাতে পারে। পথের মুক্ত বাতাস, অবারিত আকাশের গাঢ় নীলিমা, উন্মুক্ত মাঠের শ্যাম শোভা, আর তারি মাঝে লীলা আনন্দরামের নবদাম্পত্যের মঙ্গলময় মধুর প্রকাশ, বিপাশার দূরের মনকে কাছে টেনে আনল। অন্তরে বাইরে একটা মুক্তির আস্বাদ পেল।

রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে শয্যা আশ্রয় করে তার মনে হলো, সে একা নয়। সবচেয়ে এতদিন যে দূরে ছিল, সেই অমলেশকে সে সব চেয়ে কাছে পেয়েছে। কমলের আশ্রিত ভেবেই হয়তো সে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে।

লীলাকে নিয়ে একটি হপ্তা আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। একটি সপ্তাহ যেন যুগের পরমায়ু নিয়ে তাদের বন্ধুত্বকে নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র করে তুলল। মিলনের আনন্দ যেখানে গাঢ় বিচ্ছেদের বেদনা সেখানে দুঃসহ।

লীলাকে দমদম এরোড্রোমে বিদায় দিতে এসে বিপাশাও যত কাঁদে লীলাও তত কাঁদে।

অমলেশ লীলাকে বললে, এই যদি তোমার বিলেতি শিক্ষার ফল হয় লীলা, তাহলে আমি হেল্‌পলেশ্‌। তোমার এ হলো কি?

লীলা চোখ মুছে মৃদু হাসল।

আনন্দরাম বললে, ভারতের মাটিতে পা দিতেই ভারতের ভাবধারা ওঁকে গিলে ফেলেছে। এ আমাদের দেশের মাটির গুণ ব্রাদার, ওঁকে

বলা মিছে। দেখছো না, এই কদিনে কি রকম আর্ট অ্যাণ্ড আউট ইণ্ডিয়ান বনে গেছে ?

প্রতিবাদের কণ্ঠে ঝঙ্কার দিল লীলা, আমি কি ইণ্ডিয়ান নই ? বিলেতে থাকতে আমি ইণ্ডিয়ান বলে গর্ব করতুম। আমার দেশের স্বপ্ন দেখতুম। আমার দেশের মহীয়সী নারীদের জীবনী পড়ে তাঁদের আদর্শে জীবনকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতুম।

বিস্ময়ে বিপাশা তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

লীলা ভিজে গলায় বললে, ও-দেশের মত স্বামী শুধু আমার জীবনের সাথী নয়, আমার চিরপূজ্য। আমায় আশীর্বাদ করো অমুদা—

অমু-দা !

বিহ্বল-বিস্ময়ে তারপানে চাইল বিপাশা।

অমলেশ তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, আশীর্বাদ নয়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো তোমাদের মিলিত জীবন হোক এক অশেষ পিক্‌নিক্।

আনন্দরাম তার হাতে হাত মিলিয়ে আনত ভঙ্গিতে হাসল।

ফেরবার পথে, গাড়িতে বিপাশা অমলেশকে বললে, একটা কথা আজ আমায় সত্যি বলবেন ছোট বাবু ?

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে অমলেশ তারপানে ফিরে তাকাল।

বিপাশা বললে, আগে বলুন, বলবেন।

—কথাটা না শুনেই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ?

—যদি না বলতে চান, আমার তো জোর নেই। তবে আমি শোনবার জন্যে হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি।

অমলেশ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, লীলার কথা তো ?

বিপাশা ঘাড় দুলিয়ে সায় দিল : কী করে বুঝলেন ?

—বুঝতে পারি। অমলেশ হাসল।

—বেশ। বলবেন কি, আমি যা জানতে চাই ?

—মেয়েদের কৌতূহল বড় বিশ্রী।

—বিশ্রী হোক্‌, সুশ্রী হোক মেনে নিতে হবে। যখন সেটা আমার একার নয়।

—তা নয়। সব দেশের সব মেয়েদেরই গোত্র এক।

বিপাশা কাকুতির স্বরে প্রশ্ন করলে, যাকগে। বলুন না, দয়া করে।

অমলেশ বললে, নইলে তোমার ঘুম হবেনা, না?

—কিছুতেই না।

অমলেশ বললে, তোমার প্রশ্ন না শুনেই জবাব দিচ্ছি আমি। কিন্তু এই জবাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রসঙ্গের শেষ হওয়া চাই। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন নয়।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে বিপাশা তার পানে তাকাল।

অমলেশ গাঢ়স্বরে উত্তর দিল, লীলা সম্বন্ধে কমলকে যা বলেছিলুম, তা সর্বৈব মিথ্যে।

বিপাশা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, তবে?

বাধা দিল অমলেশ : শেষ হয়ে গেছে।

—ভুলে গেছি। রাগ করবেন না।

অমলেশ হেসে উঠল।

—কিন্তু কি দুষ্টু আপনি? শিক্ষিতা ভদ্র ঘরের মেয়ের সম্বন্ধে,—ছিঃ।

বাঁকা চোখে, বিপাশার আরক্ত মুখের পানে চেয়ে অমলেশ বললে, প্রয়োজন হলে, তোমার সম্বন্ধেও ঐ ধরণের কথা বলতে আমার বাধবে না। প্রয়োজনের বাধা-নিষেধ নেই বিপাশা।

—আপনার কাছে।

বিপাশা তার পানে তাকাল। অমলেশের মুখের উপর একটা ছায়া ঘনিয়ে এলো। একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস তার প্রশস্ত বুকখানাকে কাঁপিয়ে তুলল।

বিপাশা ব্যথিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

গাড়ি বাড়ির ফটকে ঢুকল।

॥ এগারো ॥

বিকেলের দিকে পুলকেশ বিপাশাকে ডেকে বললে, আমি কিছু দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি বিপাশা। কমলের লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুমি রেখে দাও। ওতে কমলের আর তোমার গয়না আছে।

বিপাশা সংশয়াকুল দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললে, এই তো কদিন পরে কাল ফিরলে, আবার কেন যাবে ?

পুলকেশ মাথা নিচু করে নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালে।

পুলকেশের পানে চেয়ে বিপাশার মনে হলো, পুলকেশ যেন বদলে গেছে। সে রোগা হয়ে গেছে। এই কটি দিনে সে যেন বুড়ো হয়ে গেছে। তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। কপালের শিরগুলো ত্রিশূলের মত ফুলে উঠেছে। রগের কতকগুলো চুল সাদা হয়েছে।

বিপাশা চেয়ে চেয়ে দেখল। মন তার করুণায় উদ্বেল হয়ে উঠল। এই লোকটি তার অনেক আবদার, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। কন্যার আদরে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে।

পুলকেশ তাকে কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে তার মাথার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বিপাশার বুঝতে বাকি রইলো না যে মনে তার ভার রয়েছে। উৎসুক দৃষ্টিতে তারপানে চেয়ে ভিজে গলায় বিপাশা জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবে ?

মুখ ঘুরিয়ে পুলকেশ উত্তর দিল, ঠিক করিনি এখনো। তবে এবার অনেকদূর যাবো।

একটু থেমে ঢোঁক গিলে বললে, এখানে আর আমি থাকতে পারছি না বিপাশা।

হঠাৎ যেন চমকে উঠে শঙ্কিত দৃষ্টিতে বাইরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের

পানে চেয়ে পুলকেশ বলে উঠল, এখানে থাকা আমার চলবে না। আমাকে যেতেই হবে।

তার গলার স্বরে, তার অস্বাভাবিক ভয়াতুর দৃষ্টির রূঢ়তায় বিপাশা কেঁপে উঠল। তার চোখে চোখ রেখে সে তাকাতে পারল না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করল।

ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে উঠল। বাইরে মেঘঘন আকাশ আরো কালো হয়ে ঝুলে নেমে এলো। দিনের আলো নিভে আসছে। খোলা দরজা দিয়ে ক্ষীণ আলো চুইয়ে এসে অন্ধকারকে নিবিড় করে তুলল।

পুলকেশ হুস হুস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বিপাশা উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিতে গেল। পুলকেশ বাধা দিল : আমাকে ছেড়ে যাসনি বিপাশা। দেখছিস তো আমি বড়ো একা।

বিপাশা বসল।

এ কি বিবেকের আর্তনাদ! চিত্তজ্বালার প্রতিচ্ছবি?

—ভয় করছে বিপাশা? বিপাশার মাথায় হাত রেখে পুলকেশ জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে আপন মনে বললে, তা আমাকে ভয় করবার কারণ আছে বই কি!

বিদ্যুৎ-চমক লাগা মানুষের মত সোজা মুখ তুলে বিপাশা পুলকেশের মুখপানে তাকাল। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরে মৃদু মৃদু হাসছে পুলকেশ। সে হাসি অসংলগ্ন। অস্বাভাবিক। মনে বিভীষিকা জাগায়।

—তুমি ওকথা বলছো কেন পিসে বাবু? আমি তোমাকে ভয় করবো কেন?

পুলকেশ সাড়া দিল না। সে একদৃষ্টে বাইরের পানে চেয়ে আছে। তার মন যেন কোন সুদূরের পানে উধাও হয়ে গেছে। তার মুখের ভাবে বিপাশা শিউরে উঠল।

শঙ্কিত কাতর কণ্ঠে বিপাশা ডাকল, পিসেবাবু!

—এঁ্যা!

কাছের মানুষ যেন দূর থেকে সাড়া দিল।

বিপাশা হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরে স্নেহোচ্ছ্বাসে অনর্গল হয়ে উঠল : আমাকে বলো পিসেবাবু, কী হয়েছে তোমার। আমি তোমার মেয়ে। আমাকে বলবেনা ?

উচ্ছ্বসিত আবেগে বিপাশার মাথাটি বুকে চেপে ধরে পুলকেশ ভাঙ্গা গলায় বললে, জীবন মরণের কথা মাকে ছাড়া আর কাকে বিশ্বাস করে বলবো ? তুই যে আমার মা।

পুলকেশ আস্তে আস্তে বললে, বাঁচাতে তুই আমায় পারবি না না। কেউ পারবে না। তবু তোকেই আমি বলবো।

উধ্বশ্বাস উৎকণ্ঠায় বিপাশার শ্বাসরোধ হয়ে এলো।

—স্বীকৃতির একটা তৃপ্তি আছে। বুকে পাথর চাপিয়ে চলাফেরা করা চলে না।

পুলকেশ উঠে দাঁড়াল।

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। বাইরের পানে চেয়ে পুলকেশ থমকে দাঁড়াল।

—আমি কাপড় ছেড়ে নিই। তুমি আমার জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করো বিপাশা।

বিপাশা যেতে যেতে ফিরে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তার পানে তাকাল।

পুলকেশ হাসল। সহজ সুরে বললে, শুধু এক পেয়ালা গরম চা কিংবা কফি। আর কিছু নয়।

চা নিয়ে ফিরে এসে বিপাশা দেখলে পুলকেশ একটা ট্রাউজার পরে আর আস্তিন গুটিয়ে একটা সার্ট গায়ে দিয়ে খোলা বিরাট একটা ক্যাবিনেটের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাবিনেটের মাথার উপর দেয়ালে টাঙানো কমলের একখানা বড় ছবি। আলমারির দরজা চেপে বন্ধ করে দিয়ে পুলকেশ ইঙ্গিতে বিপাশাকে কাছে ডাকল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পুলকেশ বললে, জানিস বিপাশা, অমুর সঙ্গে আমার আর কোন ঝগড়া নেই। সব মিটে গেছে।

বিপাশা তার পানে তাকাল। মনে হলো, পুলকেশের মনটা নরম খুশিতে ভরে উঠেছে। তবু যেন বিপাশা ওর মনের তল খুঁজে পায় না।

শূন্য পেয়ালাটা ট্রের উপর নামিয়ে রেখে বিপাশার একখানা হাত ধরে পুলকেশ বললে, একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বিপাশা। যে কথা তোমায় আজ শোনাবো সে শুধু একা তোমার জন্যে। তোমারি জানা রইলো।

—না। আর কেউ জানবে না।

শপথের ভঙ্গিতে মাথা নত করে বিপাশা প্রতিশ্রুতি দিল।

পুলকেশ তাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, কমল সংসারে সব চেয়ে ভালোবাসতো তোমাকে আর সব চেয়ে ঘৃণা করতো আমাকে। তার জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা দিয়ে সে আমাকে ঘৃণা করতো। আমাকে স্বামীর মর্যাদা দেয়নি সে কোনদিন। অথচ আমি চিরদিন তার কাছে নতি স্বীকার করেছি, হার মেনেছি। জীবনের নিষ্ফলতা আর অপমানের তীব্র আঘাত আমার অস্তিত্বকে জর্জরিত করে তুলল।

পুলকেশ থামল। বিপাশা রুদ্ধশ্বাসে তার পানে তাকিয়ে রইলো। তার মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারল না।

হঠাৎ পুলকেশের বিবৃতির মোড় ঘুরে গেল মনে হলো। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্রহাতে ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করল। বিপাশা চমকে উঠল। লাল অক্ষরে শিশিটার গায়ে লেবেল আঁটা: পয়েজন। নিচে লেখা, পোটাসিয়ম সাইনাইড।

শিশিটা বিপাশার চোখের সামনে তুলে ধরে সংক্ষেপে বললে, আর সব তুমি জানো। শুধু এইটুকু জানলেই বাকিটা বুঝতে পারবে। কোলিয়ারীতে ভিমরুল আর বোলতার চাকের জন্যে এটা মাঝে মাঝে সেখানে পাঠাতে হতো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুলকেশ চাপা গলায় বললে, এ-রি একটি ছিলকে তোমার রাখা জলের গ্লাসে মিশিয়ে দেবার জন্যে পাগলের মত আপিস থেকে বাড়ি এলুম, সকলের অজান্তে। দেখে গেলুম, কমল অকাতরে ঘুমোচ্ছে। খুন যখন মাথায় চাপে, উঃ!

পুলকেশ তুহাতে মুখ ঢাকল।

—আমায় ঘৃণা করতে শেখ, বিপাশা! আমায় ঘৃণা করিস। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করিসনি। আমি জানি তুই অন্তত প্রতিশোধ নিতে চাইবি না। তুই অন্তত আমাদের বংশ মর্যাদাকে—

পুলকেশের গলার স্বর বন্ধ হয়ে এলো। কোন কিছু না বলে আচমকা এক গোছা চাবি বিপাশার কোলে ফেলে দিয়ে সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিপাশা পাথর হয়ে গেল। তার চমক ভাঙ্গল নিচে গাড়িতে স্টার্ট দেবার শব্দে। বিপাশা ছুটে গিয়ে রেলিং-এ বুক দিয়ে দাঁড়াল।

ফটক পার হয়ে গাড়িখানা বেরিয়ে গেল। পেছনের লাল আলোটা ছোট হয়ে বিন্দুর আকারে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বিপাশা যে কতক্ষণ নিস্পন্দের মত বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল নিজেই জানে না। আবার বৃষ্টি নামতে সে আচ্ছন্নের মত ধীরপায়ে ঘরে ফিরে গেল।

ঘরের ভিতর অসহ্য গুমোট। সে গলগলিয়ে ঘেমে উঠল। পাখা খুলে দিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে বসল। তার মনে হলো পৃথিবী ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সে চোখ বুজে পুলকেশের এই নাটকীয় স্বীকারোক্তিকে প্রণিধান করবার চেষ্টা করল। কমলের মৃত্যু সম্বন্ধে যা ঘোলা ও অস্পষ্ট ছিল আজ তা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। সব সন্দেহ নিরসন করে দিল পুলকেশ নিজে। কিন্তু পুলকেশকে সে যেন কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে যেন একটা অশরীরী ছায়া। একটা সঙ্কেত। সে যেন জীবনকে অতিক্রম করে বহু দূর পথ থেকে এসেছিল নিজেকে

উদ্ঘাটিত করতে। কিংবা আর কেউ তাকে ভর করে আছে, কোন অকায়িক আত্মা। সেই তাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই তাকে তার কাছে টেনে এনেছিল। সেই তাকে নিজ মুখে ব্যক্ত করাল এই কলঙ্কিত অঘটন। অমলেশ বলেছিল হ্যামলেটের প্রেতাত্মার মত একদিন কমলের আত্মা আবির্ভূত হয়ে রহস্যের উদ্ঘাটন করে দেবে। রাঙাপিসির আত্মাই কি ওকে ভর করে ওর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করল তার মৃত্যু রহস্য কাহিনী।

বিপাশার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ পুলকেশ প্রতিদিনের মানুষ নয়। তার মুখ দেখে বিপাশার মনে এমন একটি ভাব উথলে উঠেছিল. বুকের অতলে এমনি একটি ব্যথা অনুভব করেছিল যা তাকে অবশ ও অসাড় করে দিয়েছিল। সে যেন পথভ্রষ্ট পুত্রের জন্য জননীর অন্তর্দাহ। তার মুখে চোখে লক্ষ্য করেছে সে অনুশোচনার তীব্র দাহ। অপরাধের কাঁটা বিঁধে অনুক্ষণ যে যাতনায় সে জর্জরিত, তারি বেদনা হয়তো কিছুটা লাঘব করতে এসেছিল তার কাছে।

বিপাশা কাঠ হয়ে বসে রইলো।

কমলের বড় ছবিখানার পানে দৈবাৎ দৃষ্টি পড়তেই আবার বিপাশার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কমলের উপর তার দুরন্ত স্নেহ। সেই স্নেহ উত্তাল হয়ে উঠে তার সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সব দুর্বলতা ভাসিয়ে দিল। এ দুর্বলতা পাপ। হত্যাকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া আইন বিরুদ্ধ। তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। হত্যাকারী গর্ভের সন্তান হলেও তার জন্য বিপাশা চোখের জল ফেলতো না। মনের অসতর্ক মুহূর্তে বিপাশা পুলকেশের দুঃখে বেদনাবোধ করেছিল বলেই তার প্রতি মন তার নির্মম ও কঠিন হয়ে উঠল। কমলের হত্যাকারীকে মমতা দেখানো বিপাশার পক্ষে অসম্ভব।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেল। বারান্দায় মাঝে দেখা হলো অমলেশের সঙ্গে। স্টুডিয়ো থেকে সবে সে উপরে উঠছে। পরনে একটা সিল্কের পায়জামা। গায়ে একটা স্পোর্টস

গেঞ্জি। মুখে অপরিসীম ক্লান্তি। চুলগুলো এলোমেলো। বিপাশা নিজেকে চাপা দিয়ে অভিমানের ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, সারা দিন এই দৈত্যপুরীর মাঝে একা মুখ বুঁজে এমনি থাকতে হলে নিশ্চয় এক দিন দম আটকে মরে পড়ে থাকবো।

অমলেশ তার একখানা হাত চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললে, কাল থেকে দিনের বেলা রাজকুমারীকে রূপোর কাঠির পরশ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাবো। আর সন্ধ্যায় এসে শোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে তুলবো।

বিপাশার অধরে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বললে, বেশ তাই হবে। এখন আমায় ফাঁকা হাওয়ায় খানিক ঘুরিয়ে আনবে চলো। আমার মাথা ধরেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বাইরের ঘনঘটার দিকে ইঙ্গিত করে অমলেশ বললে, আকাশের তোড়জোড় দেখেছো ?

—না হয় একটু ভিজবো। বিলেতে ছিলে কেমন করে ? বৃষ্টির ভয়ে বেরুতে না ? ম্যাকিণ্টস নিয়ে চলো।

অমলেশ হেসে বলল, তুমি রীতিমত স্পোর্টস।

—তবে না তো কি ? রেডি হয়ে নাও। আমি আসছি।

বিপাশা যে স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। সেখানে এমন কদর্য পাপের বিষাক্ত বাতাস প্রবেশ করল কেমন করে তাই ভেবে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ সংসারে পুলকেশের ছিল অপ্রতিহত প্রভুত্ব। অপ্রমেয়, অনস্বীকার্য মর্যাদা। পুলকেশ আর কমল, এদের মিলিত জীবনের স্নেহরসে বিপাশার জীবন ছিল ভরপুর। পিতৃমাতৃহারার স্নেহবঞ্চিত হৃদয়টীকে এরা দুজনে স্নেহপক্ষপুটে ঢেকে রেখেছিল। এ সংসারের মাঝে ছিল, শুচিতা ও শুভ্রতা। দয়া ও দাক্ষিণ্য। আনন্দ ও ভালোবাসা। বাড়ি ঘিরে ছিল একটী সুস্থ প্রাণময় পরিবেশ। সেই সংসার পাপস্পর্শে মলিন ও সঙ্কুচিত। বিপাশার চোখ ভরে জল

আসে। পুলকেশকে যতই সে ঘৃণাভরে মন থেকে দূরে ঠেলে দিতে চায়, ততই যেন সে অপরাধের স্বীকৃতি নিয়ে ম্লানমুখে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। শাস্তি সে মাথা পেতে নিতে চায়।

বিপাশার বুক ভারী হয়ে ওঠে। থেকে থেকে অশ্রুবাষ্পে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।........

সে তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে। সত্যভঙ্গ করেনি। অমলেশকে পর্যন্ত এখনো সে বলেনি পুলকেশের স্বীকারোক্তির কাহিনী। বিপাশা মনে মনে পণ করেছে এ নিয়ে সে অমলেশকে অগ্রসর হতে দেবে না। নিষ্কলঙ্ক বংশগরিমায় কালি মাখাতে দেবে না।

পুলকেশ বাঁচুক।

রাজদণ্ডের চেয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত আরো কঠিন এবং দীর্ঘ হবে।

কিন্তু তা হলো না।

তিনদিন পরে সকালের সংবাদপত্র খুলতে অমলেশের চোখে পড়ল :

"—মোটর দুর্ঘটনা।

কয়লাখনির মালিক এবং কলকাতার প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী পুলকেশ রায় রাঁচি হাজারিবাগের পথে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। রাত্রে তাঁর মোটরের সঙ্গে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্ঘর্ষ হয়। ফলে রাস্তার ওপর থেকে গাড়ি খাদে ছিটকে পড়ে এবং ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। গাড়ির একমাত্র যাত্রি ও চালক পুলকেশ বার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।"

খবর শুনে মুহূর্তের জন্য বিপাশার হৃদযন্ত্র যেন বন্ধ হয়ে গেল। সে পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পা তার মাটিতে বসে গেল। সে না পারল নড়তে, না পারল কাঁদতে, না পারল কোন কথা বলতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুখানা টেলিগ্রাম এলো। একখানা হাজারিবাগ পুলিশ আপিস থেকে, আরেকখানা পুলকেশের ড্রাইভার ছোট্টুর কাছ থেকে।

····একটা স্টেশন ওয়াগনে অমলেশ তখনি সদলবলে হাজারিবাগ যাত্রা করল।

পুলকেশের আধ-পোড়া দেহটা দেখে সবাই আঁতকে উঠল। তাকে চেনবার উপায় নেই। পুড়ে কালি মূর্তি হয়ে গেছে। অমন সুন্দর ঝকঝকে গাড়িখানাকে গাড়ি বলে চেনা যায় না। তালগোল পাকানো একটা লোহার বাণ্ডিল।

দুর্ঘটনার ভয়াবহ ছবিটা মনে মনে কল্পনা করে সকলে শিউরে উঠল। সকলেরি চোখে নামল অশ্রুর প্লাবন। আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল বিপাশা। পুরনো পশ্চিমা দাই মহাদেইয়া তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

পুলকেশের মৃত্যুও রহস্যাবৃত।

বাইরের সকলে জানল, এ দৈবের দুর্ঘটনা। কিন্তু অমলেশ ও বিপাশার বুঝতে বাকি রইলো না যে এ তার স্বেচ্ছাকৃত পরিকল্পিত মৃত্যু। কমলের হত্যাকে যেমন সে আত্মহত্যার পোষাক পরিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই নিজের এই বীভৎস আত্মহত্যাকে দিল দুর্ঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়ে। কেন সেই জানে। বোধ হয় তার বংশগৌরবকে অক্ষত রাখবার জন্য।

ড্রাইভার ছোট্টু বললে, বাড়ি হতে বেরিয়ে সেদিন থেকে আমরা পথে পথেই কাটিয়েছি। পথেই খেয়েছি আর চলন্ত গাড়িতে রাত কাটিয়েছি। রাঁচিতে পরশুদিন একবেলা ছিলুম। গাড়ি খারাপ হয়েছিল। ঘটনার দিন রাত্রে বাবু খানা খেয়ে এসে আমাকে খাবার ছুটি দিলেন। আমি খেতে যাচ্ছি এমন সময় বাবু আমাকে ডেকে বললেন, আমি একটু ঘুরে আসছি। তুমি খেয়ে এসে এইখানে অপক্ষো করবে। আমি মনে ভাবলুম কাছাকাছি কোথাও যাবেন, তবুও আমার মনে কেমন ভয় হয়েছিল বাবু কদিন খুব সরাব খাচ্ছিলেন।

অমলেশ জিজ্ঞেস করলে, আগে খেতেন না?

—খুব কম গাড়িতে বসে কখনো খেতেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করল।

বিপাশার কাছে ব্যাপারটা কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল। লোহার সিন্ধুকে পুলকেশ বিপাশাকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে। "যখন আমি থাকব না"—এই শিরোনামা দিয়ে।

সে যে এমনি একটা সঙ্কল্প নিয়েই সেদিন তার কাছে শেষ বিদায় নিয়েছিল, সে-কথা স্পষ্টই জানিয়েছে। কমলের ও নিজের অপমৃত্যু যাতে তার পিতৃপুরুষের পুণ্যের সংসারকে লোকচক্ষে হেয় ও মলিন করে না তোলে, তারি জন্য তার এত সতর্কতা।...."বংশের আহত ঐতিহ্য ও ক্ষুন্ন মর্যাদা আশা করি অমু বাঁচাতে পারবে"....

তারপর নিজের সম্পত্তি থেকে বিপাশাকে কিছু অংশ দেবার এবং তার বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার নির্বাহ করবার নির্দেশ দিয়েছে অমলেশকে।

সর্বশেষে অমলেশ ও বিপাশাকে অনুরোধ জানিয়েছে যদি অনিতার কোন সংবাদ পাওয়া যায় বা সে বেঁচে থাকে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে। অনিতার ওপরও সে কম অত্যাচার করেনি। তাকে সে তার সর্বনাশা প্রবৃত্তির আগুনে পুড়িয়েছে।

॥ বারো ॥

প্রবল ঘূর্ণি-বাত্যায় মন্দিরের চুড়ো খসে গেছে। উপর দিকে চাইতে পারে না পূজারী। ব্যথিত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসে। আকুলি বিকুলি করে যতক্ষণ না আবার সে ক্ষতবিক্ষত মন্দির চূড়া নতুন করে গড়তে পারে। যতদিন না অদৃশ্য হাতের নিষ্ঠুর আঘাত-চিহ্ন মুছে দিতে পারে।

বিপাশার মনের অবস্থাটা অনেকটা সেই ধরণের। যে সংসারে ছিল অখণ্ড শান্তি, সেই সংসার প্রচণ্ড সাইক্লোনে দৈবাৎ উৎখাত হয়ে গেল। সংসারে আবার সে শান্তি ফিরিয়ে না আনতে পারলে কিছুতেই স্থির হতে পারছে না।

দুর্যোগের ধাক্কা-টা কেটে গেছে। সময়ের স্রোতে আঘাতের বেদনাটা জুড়িয়ে এসেছে। আকাশের চেহারা বদলাচ্ছে। জমাট অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আবার আলো ফুটছে।

দুঃখ আর আক্ষেপ তো বাঁচবার ব্যবস্থা নয়। যা ভেঙেছে তা আবার গড়তে হবে। এই সংসারটির প্রতি তার অগাধ মমতা। এই সংসারে, এই গৃহস্থালির আনন্দ পরিবেশের মধ্যে সে আর কমল নিজেদের একটি ছোট্ট জগৎ রচনা করেছিল। সেখানকার বাড়িঘর, লোকজন সবই তাদের আদর্শে গড়া। সে সংসারকে সে ধ্বংস হতে দেবে না। এই ধ্বংসোন্মুখ সংসারে আবার তাকে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। যারা গেছে তাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা আর যারা আছে তাদের মনের লুপ্ত সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনা, বিপাশার মনে হয়, তারি দায়িত্ব। তারই একান্ত কর্তব্য। যাদের নিয়ে, যাদের সংশ্রবে এতদিন তার জীবন গড়ে উঠেছে, তারা শোকাতুর বিহ্বল দৃষ্টি

দিয়ে তারই মুখের পানে চেয়ে আছে। সে ছাড়া তাদের সান্ত্বনা দেবে কে? তাদের দেখবে কে?

বিপাশাকে কোমর বেঁধে এই বানচাল সংসারের হাল ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হলো। সে ছাড়া এ সংসারকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

মন প্রাণ ঢেলে বিপাশা সংসারের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। যারা সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে থাকে তাদের মুখে আবার হাসি ফুটল। আনন্দের গুঞ্জনে আবার বাড়ির সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগল। লোকজন, দাসদাসী সকলেই বিপাশাকে ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। তার শিষ্ট ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ। তার উপর সকলেরি একটা বিশেষ মায়া আছে। একটা সাদর সশ্রদ্ধ ভাব। কমলকে তারা যে চোখে দেখত।

বিপাশাও প্রাণপণে সকলকে সুখি করতে চেষ্টা করে।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে সে অমলেশের যে সঙ্গটুকু পায়, সেইটুকু তার উপরি পাওনা। সেইটুকুই তার সঞ্চয়। অমলেশের চিন্তা তাকে উৎসাহ দেয়। অমলেশের অস্তিত্ব তার মনের অপার নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়। তার মনের বিষণ্ণ কুয়াশা ঘুচিয়ে অনুভূতির আলো জ্বেলে দেয়। অমলেশের উপস্থিতি তার মাঝে মুক্তির মধুর স্বাদ এনে দেয়। অমলেশের মাঝে আবার সে খুজে পেয়েছে চলবার পথ। পথের স্বাধীনতা।

অমলেশের কাজে, অমলেশের সেবা-যত্নে তার গভীর নিষ্ঠা। সে দিকটায় তার একাধিপত্য।

সংসারের অন্দরমহলের কাজ ছাড়াও বিপাশাকে বিষয়-সংক্রান্ত অনেক কিছু দেখা শুনো করতে হয়। অমলেশের সময় নেই বলে। অমলেশ যখন কাজে ডুবে থাকে তখন সে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নির্বিকার। নিশ্চেতন।

বিকেলে চা খেতে উপরে এসে অমলেশ বিপাশাকে বললে, ফর্ গডস সেক বিপাশা, স্টুডিয়োতে কোন কাগজপত্র সই করাতে পাঠিয়ো

না। আজ বরং একখানা চেক বই দিও। আমি সই করে দোব। তারপর যাকে যা দিতে হয় তুমি লিখে দিও।

বিপাশা বাঁকা চোখে ঝিলিক দিয়ে কৌতুক করে বললে, আমি যদি টাকা তুলে নিই।

—টাকা নিয়ে তুমি করবে কি? টাকার তো তোমার দরকার নেই।

খিল খিল করে হেসে উঠল বিপাশা। বললে, টাকার দরকার না থাকলেও হাতে পেলে অনেকে নেবার লোভ সামলাতে পারে না।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে অমলেশ বললে, তোমার সে লোভ নেই। টাকার ওপর তোমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

—কেন আমি বৈরাগী নাকি?

—না বৈরাগী নও তুমি। তুমি জীবন তপস্বিনী। তুমি আলোক সন্ধানী। গিরি-গুম্ফায় জমাট তুষার দ্রবীভূত হবার আলোক ও উত্তাপের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে আকাশ পানে চেয়ে আছে কখন হবে সূর্যোদয়।

বিপাশা তার ভাবোচ্ছ্বাসের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, রক্ষে করো কবি। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করো।

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

চা খেতে বসে অমলেশ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। গাম্ভীর্য যেন চারিপাশে তার একটা দুর্ভেদ্য দেয়ালের মত কঠিন হয়ে উঠল। বিপাশা নিঃশব্দে তার মুখপানে তাকাল। কিসের যেন চিন্তায় তার মুখের রেখাগুলো কুটিল ও ধারালো, হয়ে উঠেছে। তার এই অটল গাম্ভীর্যকে সমীহ করে বিপাশা। তার এই গাম্ভীর্যের মাঝে সে দেখতে পায় আদিম অরণ্য পৌরুষ। তার বসবার ভঙ্গিটি সতেজ পুরুষ ও প্রশস্ত। ঋজু মেরুদণ্ড। বনদেবতার আবির্ভাব তার অকুণ্ঠ তেজোদ্দীপ্ত শরীরময়। স্বপ্নরঞ্জিত চোখে বিপাশা তার এই কঠোর সৌন্দর্য দেখে। ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় তার চিত্ত আর্দ্র হয়ে ওঠে।

অমলেশ গম্ভীর মুখে গাঢ়স্বরে বললে, মাথার ওপর দু দুটো গুরু দায়িত্বভার অথচ কোন কিছুই করতে পারছি না সময়ের অভাবে।

বিপাশা বললে, হুকুম করলেই পারো। কী এমন গুরুভার যে আমি—

না—সে তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলে অনেক আগেই তোমাকে বলতুম।

—কী শুনতে পাই না?

বিপাশা স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে তার পানে তাকাল।

অমলেশ বললে, তুমি আর অনিতা। তোমাদের দুজনের গতি করা।

বিপাশা জিজ্ঞেস করলে, কী গতি করবে?

—তোমাকে সৎপাত্রে—

বাধা দিল বিপাশা: আমার কথা নয় অনিতার কথা বলছি।

—অনিতার সন্ধান না পেলে কিছুই ঠিক করতে পারছি না। তবে আমি হাত গুটিয়ে বসে নেই। তার সন্ধানে লোক লাগিয়েছি। খবরের কাগজের মারফৎ তাকে ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছি।

চোখ বুজে মুহূর্ত কি ভাবল বিপাশা তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলে. ফিরে যদি আসে তাহলে তার গতি কি করবে?

অমলেশ বললে. সে না এলে তার সাম্প্রতিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিফহাল হতে না পারলে কোম কিছু বলা যায় না। সে যদি নিজের ব্যবস্থা নিজে করে থাকে, তা হলে আমরা হাত গুটিয়ে নেব। কিছু অর্থ সাহায্য করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার থাকবে না। তবে সে যদি তার এই নৈতিক পদস্খলনের জন্য ষ্ট্র্যাণ্ডেড হয়ে থাকে তাহলে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করবো।

—কি দিয়ে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে?

অমলেশ তার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কেন স্বামী দিয়ে, সংসার দিয়ে। জীবনের আনুষঙ্গিক সম্মান দিয়ে।

ভুরু দুটি কপালে তুলে বিপাশা বললে, ভুলে যেয়ো না ছোটবাবু এটা ভারতবর্ষ, এটা বাঙলা দেশ। এটা বিলেত নয়। এ দেশের হিন্দু সমাজে অনিতার মত পথভ্রষ্ট মেয়েকে সসম্মানে বরণ করে নেবার মত একজনও স্বামী খুজে পাবে কি?

আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে অমলেশ বললে, তা বটে। আমাদের দেশের অবিবাহিত পুরুষ মাত্রেই নাবালক। এ দেশে পুরুষ সাবালক হয় বিয়ের পরে।

একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে সে উত্তেজিত স্বরে বললে, সত্যি বলেছো বিপাশা, যে-দেশে মানুষের চেয়ে সমাজ বড়ো, জীবনের চেয়ে নীতি বড়ো, সে দেশের সমাজে অনিতার ঠাঁই হবে কেমন করে? অনিতার মত পথভ্রষ্ট মেয়েদের ওপর রাগ করবার অনেক লোক পাবে। ভাব করবার একজনও পাবে না। যারা বা ভাব করতে আসবে তারা আসবে তার দেহের লালসায়। পত্নীত্বের সম্মান দেবার জন্য নয়। জানো বিপাশা, আমাদের দেশের এই স্থিতিশীল সমাজে যে-টা মারাত্মক অপরাধ, বিশ্বের অন্যান্য সভ্য দেশে সেটা একটা ফান্। ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অনিতার মত ভুলের জন্য অন্যদেশের কোন মেয়েকে তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে হতাশ হতে হয় না। সে দেশের সমাজ তাকে ছাঁটাই করবে না আনন্দের লোভে একটা ভুল করেছে বলে। সেই মেয়ে আবার জীবনে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। শক্তি ও সুষমা দিয়ে সংসারে ফুল ফোটায়।

বিপাশা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু হঠাৎ তুমি এতো একসাইটেড্ হচ্ছো কেন?

অমলেশ মৃদু হাসল। সিগারেট টানতে টানতে বললে, আমাদের এই হিন্দু সমাজের শুধু বাইরেটায় আলো। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বিপাশা কৌতুক করে বললে, পাঁকের ওপর যে নৌকো চলে না ছোটবাবু!

অমলেশ জবাব দিল, জলের নিচে পাঁক। জল না থাকলে পাঁক জমবে কোথা থেকে? জল শুকিয়ে গেলেই পাঁক বেরিয়ে পড়ে। আবার বর্ষার জল নামলেই পাঁকের ওপর জল থৈ থৈ করে। পাঁক ধুয়ে যায়। ভুল ভ্রান্তি তো মানুষেই করবে। যে সমাজে ভুলের মার্জনা নেই, ভুলকে কিছুতেই ভুলতে পারবেনা, সে কেমনতর সমাজ। মানুষের গড়া সমাজে মানুষের ঠাঁই হবে না এ কেমন কথা?

বাঁকা চোখে ঝিলিক দিয়ে বিপাশা জিজ্ঞেস করলে, তা হলে অনিতাকে তুমি কি করতে বলো?

অমলেশ বললে, ভুল বুঝতে পারাই হলো ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। নিজের ভুল বুঝেও যদি সে সোজা পথে চলতে না পায় দুঃখের কথা।

—চলুক না সোজা পথে। কেউ তো মানা করেনি।

—মানা কেউ করবে না। অথচ সবাই তার পাশ কাটিয়ে চলবে। সবাই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। ভালোবেসে কেউ তার হাত ধরবে না। কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসবে না।

—হয়তো তাই করবে। কিন্তু তুমি তার কী করবে।

—আমি কি করতে পারবো জানি না। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করবো তাকে সুখি দেখতে। আমাদের সংসার,—আমাদের সংসারের একজন তার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছে। অপমান করেছে তার নারীত্বকে ব্যর্থ করে দিয়েছে তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে। পারি তো আমি সেই অন্যায়ের প্রতিকার করবো। আমার বংশের পাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো।

বিপাশা শূন্যদৃষ্টিতে নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো।

অমলেশ ছবি আঁকে।

বিপাশা গেরস্থালি করে।

সংসার বিপাশার। সেখানে রৌদ্রের মত তার নির্বাধ স্বাধীনতা। সেখানে সে অবারিত। তার উপস্থিতি এই বিশাল সংসারের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তার গতিবিধি, তার স্নেহস্পর্শ রেখেছে সমস্ত সংসারটিকে সুকোমল করে। এ শিক্ষা পেয়েছে সে কমলের কাছে।

সংসার তার অপরিচিত নয়। এখানে তার অজস্র স্থান। অপ্রতিহত বিস্তার। অমলেশ তার পরিসর কে সঙ্কুচিত করেনি। দেয়াল তুলে দেয়নি কোন দিকেই। বরং তার বিস্ফারকে বিস্তৃতি দিয়েছে। নিজের বোঝা বিপাশাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। বিপাশা তার সর্বশক্তি দিয়ে অমলেশের নির্ভরতাকে নিশ্চিন্ততা দিয়েছে। তাকে শিল্প সাধনার প্রচুর অবকাশ দিয়েছে।

তুজনারি মন থেকে ভয় ও আক্ষেপের ভাবটা কেটে গেছে। আবার স্বাভাবিক আনন্দোজ্জ্বল জীবনের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে। খুঁজে খুঁজে পেয়েছে জীবনের ছন্দ।

তুরন্ত শীতের পর বিপাশার জীবনে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। তার দৃষ্টি প্রখর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার মন যেন আনন্দের একটা সূক্ষ্মস্তরে এসে পৌঁচেছে। মুক্তির মদির বাতাস বইছে মনের আনাচে কানাচে। মনের রুদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে সে যেন দেখতে পায় তার আশেপাশে, আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষ জুড়ে বসন্তোৎসব চলেছে।

কাজে তার ক্লান্তি নেই।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝেও সে যেন একটা আরামের আস্বাদ পায়। ফুলের সুবাসের মত একটা মিঃঠ গন্ধ আর চাঁদের আলোর মত বিহ্বল একটা আবেশ যেন তার শরীরের ভিতর দিয়ে মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। স্বপ্নে সত্যে মেশানো দিনগুলি তার খুশিতেই কাটে।

উৎসাহোজ্জ্বল মুগ্ধ নয়নে অমলেশ তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। বিপাশা লক্ষ্য করে সে দৃষ্টিতে প্রগাঢ় স্নেহ, প্রসন্ন নির্ভরতা। আর শিল্পীর অভিনিবেশ।

বিপাশার ভাল লাগে ওকে চোখ ভরে দেখতে। মন দিয়ে ওর কথা শুনতে। প্রাণ ঢেলে ওর সেবা করতে।

বিপাশা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অমলেশের মনের মত করে সংসারটিকে নতুন করে রচনা করেছে।

অমলেশের 'হলদে দুপুর' প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একদিন সদলবলে রাজা এসে দেখে গেলেন। অমলেশ সমস্ত সত্তা ঢেলে দিয়েছে ছবির কাজে।

বিপাশা দিয়েছে তাকে অফুরন্ত অবকাশ। নিরাকুল নিশ্চিন্ততা। বিপাশা যেন তার আশেপাশে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। হাত বাড়ালেই বিপাশা। বিপাশাকে খুঁজতে হয় না। মুখ ফুটে কোন কিছু চাইতে হয় না তার কাছে। সে যেন উন্মুখ হয়ে থাকে, উচ্চকিত হয়ে থাকে নিজেকে অমলেশের কাজে লাগাবার জন্য। তারি মাঝে তার জীবনের পূর্ণতা। তারি মাঝে তার অস্তিত্বের সার্থকতা।

অমলেশ মাঝে মাঝে তাকে দেখে চমকে যায়।

বিপাশা সুন্দরী নিঃসন্দেহ। কিন্তু সম্প্রতি সে যেন দেখতে দেখতে চোখের সামনে ফুলন্ত লতার মত স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে অনুপম হয়ে উঠল। তার ঐ লতায়িত শরীরের শীর্ণতায় যে এত ফুল আর এত রঙ ছিল অমলেশ ধারণা করবে কেমন করে? সে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রচুর হয়ে উঠেছে। অতীতের অন্ধকার মেঘস্তরের অন্তরাল থেকে তড়িৎলতার মত চকিত হয়ে উঠেছে। তার দেহের স্তবকে স্তবকে মুক্তির স্নিগ্ধতা।

অমলেশ অনিমেষে তার পানে চেয়ে চেয়ে দেখে। সে যেন তার শিল্পী রক্তের গান। তার মানসলোকের স্বপ্ন। তার রঙতুলির রেখাঙ্কন।

তার চোখে সে অসহ্য বিস্ময়। কোন কিছু চায়না সে কোন কিছু পায়না সে তবু যেন তাকে অত্যন্ত সুখি মনে হয়।

বিপাশার উপস্থিতি তাকে চমকে দেয়। তার সুনিবিড় সান্নিধ্যের

সৌরভে তার মনে নেশা ধরে। অথচ মনে জাগে না অনুভবের ঢেউ। কোন সুখাবেশের ঘোর।

অমলেশের মনে হয় তার ঔদাসীন্য তার নির্লিপ্তি ওর অনুভূতির কোমলতাকে কঠিন করে তুলছে। ও নিজেকে উচ্চারণ দিতে পারে না বলে অমলেশের এই নিঃশব্দতা নিষ্ঠুর বই কি!

অমলেশ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। মনে মনে লজ্জা পায় অমলেশ।

না। সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে ওকে এমন ভাবে ক্ষয় করা চলবে না। ওর উপর অবিচার করা হচ্ছে।

দুপুরের দিকে স্টুডিয়ো থেকে উপরে এসে অমলেশ বিপাশাকে তার ঘরে খুঁজে পেলে না। এদিক ওদিক ঘুরে শেষে নিজের ঘরের দোরে পর্দা সরাতেই তার চোখে পড়ল, বিপাশা তার বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে তন্ময় হয়ে একখানা বই পড়ছে।

অমলেশ যে পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে বিপাশা জানতে পারল না।

বিপাশার অপরূপ রূপসজ্জা দেখে অমলেশ বিস্মিত ও মুগ্ধ হল। বিহ্বল, সম্মোহিত হয়ে তারপানে চেয়ে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বিপাশার পরনে একখানা কোড়া লাল ডুরে শাড়ি। এক-গা গয়না। মাথার চুলগুলো এলানো। স্তবকে স্তবকে মুখের দুপাশ দিয়ে কাঁধ ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিপাশার মুখখানি পুরোপুরি দেখা যায় না। অপরূপ ভঙ্গিতে সে বিছানায় বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। হংসীর মত ঘাড় তুলে মাথাটি কাত করে বইখানার পানে চেয়ে আছে। কানে একটি হীরার দুল দিনের স্বচ্ছ আলোয় চকচক করছে। গলার নেকলেসটা বুকের উপর দুলছে। পা-দুখানি হাঁটুর কাছে দুমড়ে উপর পানে তুলে ধরেছে। নিটোল শুভ্র সুকুমার জঙ্ঘা দুইটি অনাবৃত। যেন ফুলের দুটি দণ্ড। জানুর খাঁজে শাড়ির প্রান্তটা স্তূপীভূত। আলতা রঞ্জিত পদপল্লব দুখানি যেন দুটি রক্তকমল।

শ্রোণি শিলাতটে ক্ষীণ কটিদেশ, পিঠের বক্ররেখা, সমুন্নত কণ্ঠের বিস্ফার অমলেশের শিল্পীমনে কাঁপন জাগায়। সে চোখ ফেরাতে পারেনা।

অমলেশের কল্পলোকের মানসী যেন রূপ পরিগ্রহ করে বিহ্বল দেহে তার নিঃসঙ্গ শয্যায় সমর্পিত।

অমলেশ ধীরপায়ে ঘরে ঢুকে তার সামনে দাঁড়াল।

চমকে উঠল বিপাশা। উঠে বসবার চেষ্টা করতেই বাধা দিল অমলেশ: উঠোনা। আরেকটু দেখি।

—কী আবার দেখবে?

চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে কুটিল হাসি হাসল বিপাশা।

—আমার ছবি।

—কী ছবি?

আকুল এলায়িত চুলের অরণ্য মথিত করতে করতে উঠে বসল বিপাশা।

অমলেশের চোখে পড়ল বিপাশার কালি চাঁদের মত শুভ্র ললাটের উপর জ্বল জ্বল করছে একখানি কালো টিপ। অদ্ভুত মানিয়েছে তাকে। বাঙলার চিরন্তন বধূ!

অমলেশ ভাবের ঘোরে বললে, এই হবে আমার পরবর্তী ছবি।

—কী?

—যে জীবন্ত ছবি এতোক্ষণ প্রত্যক্ষ করলুম, প্রতীক্ষিতার সেই অপরূপ ভঙ্গিটি আমি ধরে রাখবো ক্যানভাসের পর্দায় রঙ তুলি দিয়ে।

—কী নান হবে ছবির? প্রতীক্ষিতা?

অমলেশ বিছানার উপর তার পাশে এসে বসল। আয়ত চক্ষু মেলে বিপাশা তার ধ্যান গম্ভীর প্রদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখে বরাভয়। সে যেন তার জন্য তার জীবনের পরমার্থ বহন করে এনেছে। তার মাঝে দেবতা আবির্ভূত হয়ে ওকে বর দিতে এসেছে। তার নিকটতম সান্নিধ্যে বিপাশার গায়ে পুলকের রোমাঞ্চ জাগে।

অমলেশ বললে, তুমি বলো না কী নাম হবে, প্রতীক্ষিতা সমর্পিতা ?

সভিক্ষপূর্ণ একটি কটাক্ষ হেনে বিপাশা বললে, তার চেয়ে পিয়া-পথ-চাহি ভালো।

—চমৎকার। পিয়া-পথ-চাহি।

—সে অধিকারও তো তুমি নিতে চাওনা। খুশি হতে পারবে না যখন।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাকে শাসাল বিপাশা: মুখে ঠাকুরের পেসাদ রয়েছে। দুষ্টুমী করোনা।

পূজোর উপোস করে তুমিও নিশ্চয় মিছে কথা বলোনি।

চমকে গেল বিপাশা। সে সন্ত্রস্ত হয়ে জিব কেটে দুহাতে কান নাক স্পর্শ করে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, ঠাকুর জানেন সে আমার মনের কথা নয়।

বলতে বলতে সে শঙ্কিত ভীরু বালিকার মত অমলেশের বুকের মাঝে মুখ লুকল। তার তপ্ত শরীরের ভীরু কাঁপুনি অমলেশের সর্বাঙ্গে পুলকের রোমাঞ্চ জাগাল। সে অধীর আবেগে তার মাথাটি বুকের মাঝে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলে, বলো তবে মনের কথাটি কি ?

বিপাশা মুখ না তুলেই ভিজে কম্পিত গলায় বললে, তুমি তো জানো তোমার এ আশ্রয় আমার পৃথিবীর স্বর্গ।

বিপাশার ডাগর চোখের কানায় কানায় অশ্রুর আভাস। সে কাঁপছে। বিহ্বল আকাশ যেমন কাঁপে চন্দ্রোদয়ের আভাসে। তার শরীরের রক্ত চনচন করে ঠেলে উঠছে তার মুখে; তার মাথার চুলের গোড়ায় গোড়ায়। তার বড় বড় চোখের কালো পালকগুলো লজ্জায় জড়াজড়ি করছে। অমলেশের মুখের পানে সে মুখ তুলে তাকাতে পারে না।

অমলেশ গভীর আরামে বিপাশার নরম পশমের মত চুলের উপর মুখ রেখে আশ্বাসের কণ্ঠে চুপি চুপি বললে, আমি জানি। জানি

বিপাশা, তোমাকে ছেড়ে আমার চলবে না। আমার অজান্তে আমাকে তুমি জয় করে নিয়েছো।

শিশির সিক্ত উল্লোল ফুলের মত অর্ধ-নিমীলিত চোখ তুলে তাকাল বিপাশা। অধরে ভেসে উঠল মোহিনী হাসি।

অমলেশ বললে,ডায়নাকে ছুটি দিয়ে আসি। আজ আর কাজ করবো না।

তার দিকে এক ঝলক সলজ্জ হাসি ছুড়ে দিয়ে বিপাশা বললে, তার চেয়ে তাকে পরে ডেকে পাঠাই। ওকে সন্দেশ খাওয়াবো।

অমলেশ ঠোঁট ফুলিয়ে ভ্রুভঙ্গি করলে : কেন, খবর দিয়েছে বলে ?

—খবর না দিলেই কি আমি জানতুম না কি?

অমলেশ তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলে. কী জানতে ?

বিপাশা চোখে ঝলকানি দিয়ে শক্ত গলায় বললে, জানতুম যে আমাদের বিয়ে হবে।

অমলেশ মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে নাটকীয় কণ্ঠে বললে; উত্তম; তবে তাই হোক।

—কী ?

—বিয়েই হোক। যখন উপায় নেই।

- উপায় নেই কেন গো ছোটবাবু ?

—না। কোন উপায় নেই

—কেন; শুনতে পাই না ?

একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে উর্ধ্বমুখে চেয়ে অমলেশ বললে, কারণ তো একটা নয় বিপাশা। অনেক।

—তবু কি কি বলোনা।

সোল্লাসে অমলেশ তার একখানা হাত চেপে ধরল।

তার স্পর্শের উচ্ছ্বাসে বিপাশার শরীর বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সে সরম রাঙা মুখে অমলেশকে জিজ্ঞেস করলে, হঠাৎ এই অসময়ে ওপরে উঠে এলে যে ?

তার কথার জবাব না দিয়ে অমলেশ পালটা প্রশ্ন করল, গয়না পরে হঠাৎ তুমি বউ সেজেছো কেন ?

চোখে ঝিলিক দিয়ে দুষ্টুমীর ভঙ্গিতে বিপাশা বললে, বউ হবো বলে।

—কার ?

—সেই কথাই তো এতোক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম।

মাথাটি কাত করে বাঁকা চোখের কোণ দিয়ে তাকাল বিপাশা।

—ভেবে কি ঠিক করলে ?

অমলেশের মুগ্ধ দৃষ্টি তার সর্বাঙ্গে আলাপ করছে।

—ভাবছিলুম তোমার বউ হলে সুখি হতে পারবো কি না। সারাদিন বরকে চোখের আড়ালে রেখে কোন মেয়ে সুখি হতে পারে না। সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রতিভার স্ত্রীরা নাকি অত্যন্ত অসুখি।

—তাই বুঝি ?

—তাছাড়া এই বইখানা দেখনা। স্পষ্টই বলেছে, গুড্ পেন্টারস আর অলওয়েজ ব্যাড হাসব্যাণ্ডস্—

সশব্দে হেসে উঠল অমলেশ : কী বই ওখানা ?

—লভ অ্যাফেয়ার্স অব গ্রেট মেন।

—তা না হয় হলো। কিন্তু তোমাকে হঠাৎ আমার বউ হবার স্বপ্ন দেখালে কে ?

—কেন, তুমি নিজে।

বিপাশা এলোচুলে ফাঁস দিতে দিতে তেরছা চোখে তার পানে চাইল।

অমলেশ সবিস্ময়ে প্রতিবাদ করল, আমি ? কী রকম ?

—কেন, তুমি তোমার হলদে দুপুরকে বলোনি যে আমি তোমার ফিয়াসেঁ ?

অমলেশ হেসে কেটে পড়ল : ডায়না ? ডায়না বলেছে ?

বিপাশাও মুখ টিপে হাসল।

হাসি থামিয়ে অমলেশ বললে, তুমি যেমন তাকে দুষ্টুমী করে বলেছিলে আমি তোমার বয় ফ্রেণ্ড, আমিও তেমনি বলেছি।

বিপাশা মুখ টিপে হাসতে হাসতে অধোবদনে বললে, ডায়না সেদিন টাকা নিতে এসে আমাকে ধরে বসলো তাকে বলতে হবে তোমাতে আমাতে সম্পর্কটা কী? কি বলি, বললুম, বয় ফ্রেণ্ড।

বিপাশার অধরে হাসির ঢেউ। বিজয়িনীর দর্পিত হাসি।

—খুব দুষ্টু হচ্ছো—

বিপাশা লীলায়িত ভঙ্গিতে বিছানা থেকে নেমে বললে, এইখানে তোমার খাবার এনে দিই। ঠাকুরের প্রসাদ। ফলমিষ্টি। তারপর চা দেব।

অমলেশ প্রশ্নভরা চোখে তার পানে চাইল।

বিপাশা বললে, আজ যে লক্ষ্মীপূজা।

—তাই বুঝি লক্ষ্মীঠাকরুণ সেজেছো।

—শুধু সাজা নয়। উপোস করেছি।

—তুমি লক্ষ্মীপূজার উপোস করলে কোন অধিকারে? সে তো করবে এ বাড়ির বউ।

চোখ ঘুরিয়ে গলায় জোর দিয়ে বিপাশা বললে, অধিকার পাবো জেনে করেছি। অধিকারের প্রত্যাশায় করেছি।

আঙুলের রেখায় আঙুল দিয়ে গাঢ়স্বরে অমলেশ বললে, এক নম্বর হচ্ছে, তোমার মাঝে কমলকে দেখতে পাই।

বিপাশার চোখদুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে অমলেশের দিকে চেয়ে রইল।

অমলেশ বললে, দুনম্বর হচ্ছে, তুমি ছাড়া এই বৃহৎ সংসারকে এবং এই ব্যাড হাসব্যাণ্ডকে কেউ সুষ্ঠুভাবে ম্যানেজ করতে পারবে না।

কুটিল কটাক্ষ হেনে স্পর্ধিত ভঙ্গিতে বিপাশা বললে, তা কেউ পারবে না।

—তিন নম্বর হচ্ছে, বিয়ে না হলে তুমি কাছে শুতে দেবে না—উঃ।

বিপাশা তার গায়ে চিমটি কেটে আরক্ত মুখ হেঁট করে বললে, কী দুষ্টু, যে-টা শুনতে চাই সে-টা কিছুতেই মুখ ফুটে বলবে না।

অমলেশ তাকে কাছে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে, সে-টা বলবে তুমি।

বিপাশা তার বুকের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে বললে, রাঙাপিসির কাছে তোমার ছবি দেখেই তোমাকে আমি ভালো-বেসেছিলুম।

—মে আই কাম ইন্?

পর্দার বাইরে ডায়নার গলা শোনা গেল।